আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে

অভীক দত্ত

সূচিপত্র

১ মিলির ডায়েরি

সকাল থেকে বাড়িতে এক্কেবারে যা-তা অবস্থা চলছে। বাবার স্বভাব হল ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমে চোখ বন্ধ করে দৌড়োবে। বাথরুমের ভেতরে যদি কেউ থাকে তাহলে তার অবস্থা খারাপ করে দেবে। বাইরে থেকে চেঁচিয়েই যাবে। আজ বাবা আর চেঁচাতে পারছে না। দাদা এসেছে। দাদার সঙ্গে বউদিও।

দাদা ইঞ্জিনিয়ার। গুরগাঁওতে থাকে। বউদি একদম শহরের স্পেশাল পালিশ করা চিজ। বাথরুমে গেলে বেরোবার নাম করে না। ওরা আসবে বলে বাড়ি রং করা হয়েছে। বাড়ি রং করতে গিয়ে দেখা গেছে ঘরের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। সবকিছুতে কেমন চুন চুন ভাব। সেটা পরিষ্কার করতে গিয়ে মা-র, আমার আর দিদির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান ক্লোজে আছে বলে কমোডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এত কিছু করে আজকে বাবা সকালে চোখ বন্ধ করে বাথরুম যেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে দরজা বন্ধ। একবার ক্ষীণস্বরে “কে?” বলে চেঁচানোর পরেই ভেতর থেকে বউদির গলা ভেসে এসেছে, “আমি বাবা।”

তারপর থেকে করুণ মুখে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসেছে। বাবা ইসবগুলের ভুসি খেয়ে ঘুমায়। সকালে উঠে ভুসি এক্কেবারে তাড়া করে বাবাকে। যতক্ষণ না পুরো জিনিস ডাউনলোড করতে পারে ততক্ষণ বাড়ি মাথায় করে তোলে। আজকে বাবাকে দেখে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। বউদি আছে বলে বেচারা কিছু বলতেও পারছে না। মা রান্নাঘরে সকাল থেকেই জাতির উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়ে বসে আছে। দুপুরের রান্নার কাটাকাটিগুলো করছে। এদিকে দিদি লুচি আলুরদম বানাচ্ছে। আমার অবশ্য একটা

সন্দেহ উঁকিঝুঁকি অলরেডি দেওয়া শুরু করেছে যে যখনই সব রান্না শেষ হবে তখনই বউদি নাক কুঁচকে বলবে, "সো মাচ অয়েল। আমি লুচি একদম খাব না। ইয়াক।"

তার জন্য দিদি কোনও ব্যাক আপ প্ল্যান রেখেছে নাকি জানি না অবশ্য। আমি খুব একটা চাপ নিচ্ছি না। মোবাইল ঘেঁটে যাচ্ছি সকাল থেকেই। অয়নদা ডিপি চেঞ্জ করেছে। ঢলানি মধুমিতাটা যথারীতি ন্যাকামি শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর গায়ে লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দি। সব ছেলেদের কাছেই একটা করে ইট পেতে রেখে দিয়েছে। যেখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাবে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। অয়নদা আমাদের বাড়ি এলেই টুক করে কোনও না কোনও ছুতোতে এসে পড়বে। এসেই হাজারটা ভাট শুরু করবে। দিদি অবশ্য ওকে কিছু বলে না। ও জানে মধুমিতা এলেই আমি রেগে যাই খুব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও মধুমিতাকে কিচ্ছু বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। অয়নদা নোটসগুলি চুপচাপ নিয়ে চলে যায়। আর...

উফ! আমার এই বদভ্যেস। লিখতে বসেছিলাম বাবার বাথরুম কেলেংকারি নিয়ে, আর কথাগুলো যথারীতি অয়নদার দিকে চলে গেছে। ডায়েরির শেষ পাতায় এম + এ অবশ্য অনেক লুকিয়ে লিখে রাখি। দিদি দেখলে আর রক্ষা নেই। খেপিয়েই মেরে ফেলবে। সেদিন একটা যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখেছি। অয়নদা আর আমি রিকশা করে কোথায় একটা যাচ্ছি আর প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রিকশাওয়ালা রিকশার হুড তুলে দিয়েছে, প্লাস্টিকটা সামনে ফেলে দিয়েছে, আর অয়নদা আমার হাত ধরেছে। সকালে উঠে স্বপ্নটা যতবার ভেবেছি ততবার মনে মনে হেসে ফেলেছি। মরেছে... আবার বেলাইন।

যাই হোক, যেটা বলছিলাম আর কী, বাবা এদিকে বাইরে চেয়ারে বসে মনে মনে বউদির বাপবাপান্ত করছে, এদিকে মুখটা করুণ করে রেখেছে, সেটা দিব্যি বুঝতেই

পারছিলাম। এদিকে লুচির গন্ধে বাড়িটা একেবারে ম-ম করা শুরু করে দিয়েছে। দাদা চিরকালই এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না বাড়িতে থাকলে, তাই কোনও চাপ নিচ্ছে না।

সকাল আটটা। এখনই রোদ্দুর বাবাজি রোদ্দুর রায়ের মতোই মেজাজ খারাপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। দিদির মোবাইলে মনে হয় একটা মেসেজ এল।

অনেক কন্ট্রোল করেও শেষ অবধি পারলাম না। কালকেই প্যাটার্ন লকটা দেখেছিলাম। দিদি রান্নাঘরেই চাপ নিয়ে রান্না করে যাচ্ছে। তবু আর-একবার সেদিকটা দেখে দুরুদুরু বুকে ফোনটা আনলক করলাম।

অয়নদা! লিখেছে, "বিকেলে আসছি। থাকবি তো?"

অয়নদা! দিদি! সত্যি?

২

রূপম জানে শ্রাবন্তী তাদের বাড়ি আসতে পছন্দ করে না। মফস্সল ওর পছন্দ না। কিন্তু সে সবকিছু জেনেও চুপচাপ চলে আসে। এটা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলে। শ্রাবন্তীর আবার উপর উপর দেখনদারিটা ভালোই আছে। সে ভালো করেই জানে রূপম তাকে ছাড়া বাড়ি গেলে সেটা মোটেও তার পক্ষে ভালো বিজ্ঞাপন হবে না। সুতরাং এদিক-ওদিক অনেক অজুহাত দেখিয়ে শেষমেষ তাকে যেতেই হয় রূপমের সাথে।

শ্রাবন্তী তাকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। এই জিনিসগুলি তার চাই। তার জন্য বাড়ি আসার অভিনয়টুকু ও অনায়াসে করে দিতে পারে। লিস্টের মধ্যে যেগুলো আছে –

১) একটা টু বিএইচকে ফ্ল্যাট। রাজারহাটে হলে ভালো। নইলে কলকাতার অন্য কোনও ক্রিম লোকেশনে।

২) একটা সেডান গাড়ি।

৩) বছরে অন্তত একবার একটা বড়ো বিদেশ ট্যুর।

রূপম লিস্টটা মোবাইলের নোটে সেভ করে রেখেছে। মাঝে মাঝে বের করে দেখে। শ্রাবন্তীর এই লিস্টের বাইরেও তার নিজের একটা লিস্ট আছে আলাদা নোটে। সেগুলি হল –

১) বাবার পেনশনে ঘর খুব একটা ভালোভাবে চলে না। তার জন্য বাড়িতে একটা ভালো অ্যামাউন্টের টাকা পাঠাতে হবে।

২) বাবা তাকে বলে রেখেছে তাকে পড়াতে পিএফের একটা বড়ো অংশ চলে গেছিল। দুটো বোনের বিয়ের জন্য টাকা যেন সে রেখে দেয়।

আজকেও রূপম ঘুম থেকে উঠে দুটো লিস্ট দেখল। আর-একবার মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স দেখল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে "দূর বাল" বলে পাশ ফিরে শুল। চাপ সে কোনওকালেই নিতে পছন্দ করে না, কিন্তু শ্রাবন্তী মাঝে মাঝে ভালো চাপেই ফেলে দেয়। গেল মাসে পাশের ফ্ল্যাটের আগরওয়ালের বাচ্চাটার জন্মদিন গেল। সে অত চিন্তা করেনি। অফিস থেকে ফিরে শ্রাবন্তীকে নিয়ে চলে গেছিল শপার'স স্টপে। শ্রাবন্তীকেই কিনতে বলে দিয়েছিল যা কেনার। শ্রাবন্তী জিনিস পছন্দ করে হাসি হাসি মুখে তাকে বলল, "ক্রেডিট কার্ডটা দাও।" সে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে মোবাইলে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস খেলায় মনোযোগ দিতে না দিতে বিস্ফারিত চোখে লক্ষ করল তার বউ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার গিফট কিনে ফেলেছে। সে ওখান থেকে বেরিয়ে শ্রাবন্তীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই শ্রাবন্তী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল, "এটা কি তোমার ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর পেয়েছ? সোসাইটিতে আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। তা ছাড়া অত্ত কিউট একটা বাচ্চা।"

রূপম বরাবরের মতোই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কিছু বলল না। শ্রাবন্তীকে তার বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। আসলে কাউকেই তার বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। ছোটোবেলা থেকেই সে ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট। বিয়ের পরে আরও বেশি করে খোলসে ঢুকে গেছে। মাঝে মাঝে চুপিচুপি বাবার অ্যাকাউন্টে এনইএফটি করে বাড়িতে ফোন করে দেয়। এবার যেমন পইপই করে সবাইকে বলা আছে মাসে পাঠানো টাকার অ্যামাউন্টটা

যেন শ্রাবন্তীর সামনে একেবারেই আলোচনা না হয়। ফিল গুড, ফিল গুড, আচ্ছে দিন, আচ্ছে দিন পরিবেশে যেন ভালোয় ভালোয় তারা গুরগাঁও ফিরে যেতে পারে।

বাড়িতে আজ লুচি হচ্ছে। তার ফেবারিট। মা আর রূপসী সেইজন্যই জান লড়িয়ে দিয়েছে সে ভালো করেই জানে। শ্রাবন্তী সকাল থেকে বাথরুম আলো করে বসে আছে। বাবা শেষমেষ পাশের বাড়ি দৌড়েছে আর চাপতে না পেরে। সাড়ে আটটায় ঘুম ভেঙে গেলেও রূপম বাড়িতে থাকলে সাধারণত বিছানা ছেড়ে ওঠে না। আজ উঠল। নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তেই রূপসী তাকে দেখে ডাক দিল, "এই দাদা, বউদি কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে বাথরুমে ঢুকেছে নাকি রে?"

হেসে ফেলল রূপম। রূপসী শ্রাবন্তীর ভালোই লেগ পুলিং করে। তবু সে অবাক হয়ে দেখেছে তাদের বাড়ির মধ্যে একমাত্র রূপসীকেই শ্রাবন্তী কিছুটা পছন্দ করে। এর কারণটা সে এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেই আবিষ্কার করতে পারবে।

৩

ছেলেকে আজকাল একটু ভয়ই পান বিভাসবাবু। ছোটো থাকতে কতবার পিটিয়েছেন, কান ধরে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, বাথরুমে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে আগাপাশতলা জুতিয়েছেন, নরেন মাস্টারের মেয়ের সাথে প্রেম করতে গেছিল বলে তিনবেলা খেতে দেননি, এসব আজকাল ভাবলেও ভয় লাগে তার।

রিটায়ারমেন্টের আগে বুকে বল ছিল, দেহে শক্তি ছিল, আগে পিছে ভেবে কাজ করতেন না, যেটা ইচ্ছা সেটা কিনে ফেলতেন... হঠাৎ করে রিটায়ারমেন্টের পরে নিজেই বুঝতে পারলেন এই বেশি বয়সে বিয়ে করা একটা ঐতিহাসিক ভুল হয়ে গেছে। বিয়ে করেছিলেন তাও ঠিক আছে, তিনটি ইস্যু ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। স্ত্রী অনামিকার সাথে তাঁর দশ বছরের পার্থক্য। বিয়ে করার আগে মেয়েমহলে ভালোই জনপ্রিয় ছিলেন এককালে। ভেবেছিলেন এভাবেই কেটে যাবে। শেষ পর্যন্ত বাবা রেগেমেগে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন।

যা হয়েছে অবশ্য বিভাসবাবুর কাছে একদিকে ভালোই হয়েছে। হিসেব করে দেখেছেন যে ক-টা মেয়ের সাথে তিনি এককালে লাইন মেরেছিলেন, তার একজনও অনামিকার নখের যোগ্য নয়। একটু একটু করে টাকা বাঁচিয়ে, কীভাবে সংসারটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা অনামিকার থেকে ভালো কেউ জানেন না। এদিকে হামলে পড়ে সংসার করাও আছে, অন্যদিকে তাঁর দিকেও কড়া নজর। স্বামীর ডায়াবেটিসের প্রেমের ছোঁয়া লাগার পর থেকে কীভাবে চায়ে চিনি কমিয়েও চা-টাকে চায়ের মতো বানাতে হয় তাতে অনামিকার মাস্টার ডিগ্রি করা আছে। আবার সামান্য কুচো চিংড়ি যে ইঁচড়কে কোন

স্বর্গীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে এ ব্যাপারেও তিনিই সেরা। সুতরাং গিন্নি ভাগ্য বিভাসবাবুর ভালোই।

কিন্তু বিভাসবাবু আজকাল ছেলেকে ভয় পান। যে সামান্য সঞ্চয় আছে তাঁর তা এই বাজারে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সোনার দাম থেকে শুরু করে ফাউ খেয়ে নিন্দে করে যাওয়া পাঁচশো লোকের খাওয়ানোর খরচও কম না। রূপমের বিয়ের সময়েও বেশ মোটা টাকা খরচা হয়ে গেছে। রূপম তখন সবে সবে চাকরিতে ঢুকেছে। বিয়ে করার জন্য হাত পেতে বসল। চাকরি ছিল তখন। পিএফ থেকে নন-রিফান্ডেবল লোন তুলে ফেললেন ভালো অ্যামাউন্টের। এর আগেও নিতে হয়েছিল রূপমকে পড়াবার সময়ে। এখন ব্যালান্স শিট মিলছে না। মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য তাই রূপমের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁকে থাকতেই হবে। আর রূপমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হলে ছেলেকে একটু ভয় পেতেই হবে তাকে।

বউমা বাথরুমে গেলেও বিভাসবাবু তাই বেশি জোরে চেঁচাতে পারেন না। শেষে লুঙ্গিতেই হয়ে যাবে বলে পাশের বাড়িতে দৌড়োতে হয় তাকে। মোট কথা তিনি একেবারে ভালো নেই। ভেতরে ভেতরে ভয়ে ভয়ে তিনিও চান ভালোয় ভালোয় ছেলে বউমাকে নিয়ে এ ক-টা দিন থেকে আবার গুরগাঁও ফিরে যাক। ওই ফোনে "কী রে কেমন আছিস, খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিস" টাই ঠিক আছে। সামনাসামনি হওয়াটাই টেনশনের। কেমন যেন একটা চোরা অস্বস্তি কাজ করে মনের ভিতর।

বাড়িতে লুচি হচ্ছে। বেজার মুখে কাগজটা খুলে বসে মনে মনে খিটখিট করতে থাকেন তিনি। অনামিকা তাঁকে লুচি দেবে না। ডাক্তার বলেছে তেলের জিনিস যত কম শরীরে প্রবেশ করে ততই মঙ্গল। অনামিকা সেই গাইডলাইন এক্কেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন

করে চলেন। এমনকি বাপের অত প্রিয় মেয়ে দুটোও। কিছুতেই একটা ওই হালকা তেলে ভাজা স্বর্গীয় ময়দার জিনিসটা তাঁর পাতে পড়ার কোনও চান্স নেই। সেই রুটি আর ভ্যাদভ্যাদে পেঁপের তরকারি দিয়েই ব্রেকফাস্ট সারতে হবে।

ডাইনিং টেবিলে বসে কাগজ পড়তে পড়তে তাই নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করছিলেন তিনি, এই সময়ে রূপম এল। বিস্মিত হলেন তিনি, কারণ রূপম সাধারণত বাড়িতে থাকলে এগারোটার আগে ওঠে না। কাগজ পড়তে পড়তেই চশমার ফাঁক দিয়ে ছেলেকে দেখলেন বিভাসবাবু। কেমন শান্ত হয়ে বসে আছে টেবিলে। ছেলের অবস্থা ভেবে তিনিও একটু মুষড়ে পড়লেন। বেচারা! এই বয়সেই এত কিছু চাপ নিয়ে চলতে হচ্ছে। খারাপ লাগছিল। ভয়টা পেরিয়ে আস্তে আস্তে খারাপ লাগাটাই জাঁকিয়ে বসল। গলা খাঁকরানি দিলেন একটা, “কী রে, এত সকালে উঠলি আজ?”

রূপম তার হাতের কাগজটার খেলার পাতা দেখছিল, বাবার প্রশ্ন শুনে বলল, “ঘুম ভেঙে গেল। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। আচ্ছা বাবা, তুমি তো একবার গুরগাঁও ঘুরে যেতে পারো! তোমার ইচ্ছা করে না আমার ওখানে গিয়ে থাকতে?”

ছেলের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে “পাগল নাকি” বললেও বাইরে সে মুখের ভাব প্রকাশ করলেন না। বললেন, “না রে, এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। তোর বোন দুটোর বিয়ে হোক, তখন নাহয় মাঝে মাঝে...”

মিলি এসে বসল টেবিলে। বলল, “বাবা! আমাদের বিয়ে ছাড়া কি তোমার আর-কোনও চিন্তা নেই?”

বিভাসবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মেয়েকে তিনি কী করে বোঝাবেন... এই চিন্তাটা কীভাবে দিনরাত তাঁর মাথাটাকে ঘিরে পাক খেয়ে যাচ্ছে!

৪ মিলি

স্যার একটা কঠিন মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। দোষের মধ্যে স্যার আকবরের শাসনকাল নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিলেন আর আমি মধুমিতাকে ফিসফিস করে দিদির মোবাইলে দেখা মেসেজটার কথা বলছিলাম। মধুমিতাদের বাড়িতে স্যার পড়াতে আসেন। প্রথম প্রথম "স্যার তুমি" করে বলতাম। একদিন দিদি শুনে সে কী হাসি। বলে, 'পাগলী স্যারকে তুমি করে বলে নাকি? স্যার তো আপনি।" তারপর থেকে আমার আপনি বলা শুরু হয়েছে।

বাড়িতে দাদা বউদি এসেছে কোথায় আজকে ছুটি পাব তা না, মা জোর করে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্যারের পেছনে গুচ্ছখানেক টাকা যখন যায় তখন স্যারের কাছে একদিনও মিস করা যাবে না! মাথা বেশ গরম ছিল। কিন্তু মধুমিতাদের বাড়িতে আসার পরই প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম। দিদিকে ট্র্যাক করতে হবে। এদিকে ক্লাসমেট আর ওদিকে লাইন চলিতেছে! তাও কিনা আমার ক্রাশের সাথে। সবকিছু জানতে হবে আমায়। সত্যিই কি কিছু আছে কি না! আর এইজন্য মধুমিতাকেই লেডি ফেলুদা নিযুক্ত করতে হবে। সত্যি বলতে কী ছেলে গোয়েন্দারা যতই বড়ো বড়ো সমস্যা সমাধান করে ফেলুক, কারও হাঁড়ির খবর বের করতে মেয়ে গোয়েন্দাদের জুড়ি নেই। একবার যদি এরা মনে করে কোনও তথ্য দরকার, আস্তে আস্তে সব পেট থেকে ঠিক সব কথা টেনে বের করে নেবে। মধুমিতা কিছুদিন অয়নদাকে নজরে রাখুক। দেখুক কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই চলছিল আর সেই সময়েই স্যার পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। স্যার এমএ-র ছাত্র। আমাদের থেকে বেশি বড়ো না। কিন্তু তেজে এক্কেবারে বিরাট কোহলি।

বললেন, "তোমরা তো সবই জানো দেখছি। পড়াবার কি আর কিছু দরকার আছে? খামোখা পড়াচ্ছি। মাস গেলে মাইনে নিয়ে গেলেই পারি!"

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, "না স্যার, আসলে আমরা রাত্রে একটা গ্রুপ স্টাডির প্ল্যান করছিলাম তো তাই আর কি..."

বলছিলাম আর মনে মনে হাসছিলাম। গ্রুপ স্টাডি না ছাই। কিন্তু ইমেজটাও তো ঠিক রাখার একটা ব্যাপার আছে, তাই না?

স্যার যদিও আমার প্রশ্নে খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সেটা তো পড়ার পরেও করা যেত, তাই না? আমি দেখেছি, এই ব্যাচে তুমি আর মধুমিতাই একটু বেশি গসিপিং করো। দ্যাখো, সেরকম হলে কিন্তু তোমার বাবা মা-র সাথে কথা বলব আমি।"

আমি বুঝে গেলাম কেলো আসন্ন। এক্কেবারে আত্মসমর্পণ করে দিলাম, "স্যার, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আর হবে না।"

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে দেখছি, এরপরে যদি হয় তাহলে বুঝতেই পারছ।"

স্যার পড়ানো শুরু করলেন আবার। আমাদের ব্যাচটা সাতজনের। আমি আর মধুমিতা মেয়ে আর পাঁচটা ছেলে। পাঁচটা ছেলের চারটে এক্কেবারে রাহুল দ্রাবিড়ের মতো কপিবুক ভালো ছেলে। আর-একটা আছে, পার্থ। ব্যাটার নজর ভালো না। কথা বলতে বলতে বুকের দিকে তাকানোর বদভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় চোখ গেলে দি পেন

দিয়ে। এখনও যখন স্যারের সাথে আমার এই কনভোটা চলছে, মিটিমিটি হাসছিল। স্যার পড়ানো শুরু করতেই আমি কড়া চাউনি দিলাম একটা ওর দিকে। সামনাসামনি চাউনি খেয়ে একটু ভেবলে গেল।

সত্যি কথা বলতে কী আমিও জানি, আমার বাবা মা-ও জানে পড়াশোনা আমার বেশি হবে না। কোনওমতে মাধ্যমিক পাশ করেছি বটে কিন্তু দাদা আর দিদির মতো সায়েন্স পাইনি। ভাগ্যিস পাইনি, কারণ অঙ্ক দেখলে আমার গায়ে রীতিমতো ভূমিকম্প দিয়ে জ্বর আসে। তা ছাড়া পৃথিবীর সবাইকে অঙ্ক জানতে হবে এরকম মাথার দিব্যিও কেউ দেয়নি। এই কথাটা অবশ্য আমার না। অয়নদার কথা। অয়নদার এই কথা কেন, সব কথাই দারুণ। অয়নদার সঙ্গে কাটানো সব ক-টা সময়ই দারুণ।

অয়নদার হাসি দারুণ, অয়নদার হাতের লেখা দারুণ, অয়নদার লেখা কবিতাগুলি দারুণ, এমনকি অয়নদা যে গ্লাসে জল খায় সেই গ্লাসটা পর্যন্ত দারুণ। আমি গ্লাসটা ধুই না। ওই গ্লাসেই জল নিয়ে খাই। কেমন একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়।

আমি একটা জিনিস ঠিক করে নিয়েছি, দিদির সাথে যদি অয়নদার কিছু থেকেও থাকে, আমি তবু অয়নদাকেই ভালোবাসব। তাতে যা হবার হবে।

৫

অনেকদিন কচি মেয়ের গায়ের গন্ধ পায়নি সে।

নিজের মুদির দোকানে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নারান। বয়স হচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছাটা তো একইরকম আছে। কাঁহাতক আর এক মেয়েছেলে নিয়ে শরীরের খিদে মেটানো যায়! ওইসব পাড়াতে গেলে আবার বিভিন্নরকম রোগের ভয় আছে। আর ওপরে ফাউ টাকা দিয়ে আসতে হয়, কী দরকার!

এই বাধা থেকেই তো সে প্রথম রেপ করেছিল সেভেনের মেয়েটাকে। স্কুল থেকে ফিরছিল। আমবাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট। নারান ক-দিন ধরেই ওঁত পেতে ছিল। একদিন সাইকেল আটকে মুখ চিপে কাছের পরিত্যক্ত ইটভাঁটার কাছে নিয়ে গিয়ে যা করার করে ফেলল। মেয়েটা গোঁ গোঁ করছিল, নারান বুঝতে পারছিল জোরটা বেশিই হয়ে গেছিল। মাথাটা অবশ্য বরাবরই ঠান্ডা তার। জীবনের প্রথম খুনটা করতেও কোনও অসুবিধা হয়নি। যখন মনে হচ্ছিল মেয়েটা একটু বেশিই কাহিল হয়ে পড়েছে, আর রিস্ক নেয়নি সে। গলাটা খানিকক্ষণ অবহেলায় ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিল। দশ মিনিট পরে আবার বাজারে নিজের দোকানে নির্বিকারভাবে বসে থাকতে দেখা গেছিল তাকে। এলাকায় ক-দিন ধরে হইচই, দোকানে দোকানে কথা, বাজারে, চায়ের দোকান সরগরম, লোকে লোকারণ্য, নারান কিন্তু চুপচাপ। আর পাঁচটা লোকের মতোই দোকানে বসে আছে। জিনিস বিক্রি করছে। বাড়িতে বউয়ের কথা অনুযায়ী বাজার এনে দিচ্ছে, ছেলেকে সাইকেল করে স্কুলে দিয়ে আসছে। কস্মিনকালেও কেউ কোনওদিন ভাবতে

পারেনি এত বড়ো কাণ্ডের মূলে তার মতো একজন "নির্বিরোধী, নিরীহ" লোক এই কাজ করেছে।

একবার না, দুবার না, নারানের হিসেবে এখন পাঁচটা ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারে না কে করছে এত কিছু। ঘটনা ঘটার ক-দিন খুব পুলিশি তদন্ত চলে, এলাকার পুরোনো পাপীগুলোকে পুলিশ তুলে নিয়ে চলে যায়। এই ক-টা দিন নারান চুপচাপ থাকে। একেবারে কোনওরকম বেচাল করে না। গত তিন বছর আগে শুরু করেছিল এই কাজটা। তিন বছরে পাঁচবার মানে ছ-মাসে একবার। তার নিজের কাছে স্ট্রাইক রেট ঠিকই আছে।

কচি মেয়েগুলি যখন ছটফট করে, প্রথমে প্রবলভাবে বাধা দিতে দিতে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সেই সময়টাই তার নিজেকে সবথেকে বেশি পরিতৃপ্ত মনে হয়। একবার গায়ের জোর পুরোদমে প্রয়োগ হয়ে যাবার পরে তো নিস্তেজ হয়েই থাকে, তারপরে সুইচ অফ করে দেবার মতো করে খুন করাটা আজকাল তার কাছে জলভাত হয়ে গেছে। শেষবারের সময় অবশ্য মেয়েটা মারাই গেল। তাতেও অবশ্য সে কাজটা অসম্পূর্ণ রাখেনি। করেই নিয়েছিল।

দোকানে বিভিন্নরকম বিশেষজ্ঞ বসে। সে সবার কথাই শোনে। এক পক্ষ বলল এটা কিছুতেই একা কেউ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও গ্যাং আছে এর পেছনে। কোনও পক্ষ আবার পুরো ব্যাপারটা রসিয়ে রসিয়ে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল।

সে চুপচাপ নির্বিকার মুখে এদের কথাগুলি শোনে। নারান খুব ভালো করেই জানে, একা এভাবে করাটা কতটা কঠিন। কিন্তু সে নিজেকে একজন শিল্পী বলে মনে করে। যে লোকটা ভালো ছবি আঁকতে পারে, তার থেকে সে নিজেকে কোনওভাবেই কম করে

দ্যাখে না। একা একা বসে এক-একটা কেস মনে করে, আর নিজের তারিফ করে। কী অবিশ্বাস্য নিখুঁত দ্রুততায় গোটা ব্যাপারটা করে ফেলেছিল সে।

দোকানে বসে বসে আগের কেসগুলির কথাই ভাবছিল সে। প্রায় সাত মাস হতে চলল সে চুপচাপ বসে আছে। লাস্ট কেসটায় খুব হইচই হয়েছিল। এক মেয়ে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ঝুলিয়ে গ্রামের নির্জন দিকটায় এসেছিল কীসব ফটো তুলতে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল। নারান তক্কে তক্কে ছিল। তিনদিনের মাথায় সাফল্য এল। কিন্তু মেয়েটার মাথাটায় চোট লাগার ফলে মেয়েটা আগেই মরে গিয়েছিল। নারান মাথা লক্ষ্য করে ইট মেরেছিল। কাছে গিয়ে দেখেছিল বেজায়গায় লেগে ওখানেই পড়ে আছে। মরে যাবে আগে বুঝতে পারেনি। কাবু করাটাই টার্গেট ছিল। সেটা হয়ে ওঠেনি বলে খারাপ লেগেছিল।

তারপর লাশটাকে কাছের পুকুরে ফেলে চলে এসেছিল সে।

কদিন ধরে আবার মনটা কেমন করছিল তার। অনাবৃত দেহের গন্ধটা স্বপ্নেও আসছিল তার। দোকানে বসে বসেই চোয়াল শক্ত করল সে। অনেকদিন হল। এবার আবার নামতে হবে।

৬

বন্ধুদের মধ্যে কেউ সফল হলে পাড়ার বাকি বন্ধুরা সবাই যে উদ্বাহু নেত্য করে, তা নয়। রূপম জানে, যে বন্ধুদের সঙ্গে কৈশোরে, বয়ঃসন্ধিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, মেয়ে দেখেছে, নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কিত জিগস পাজল সলভ করেছে, তারাই এখন অনেক দূরে চলে গেছে। তবু সন্ধেগুলো বাড়িতে বসে সময় কাটাতে তার ইচ্ছা করল না। এর আগেও ক্লাবে গিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। এবারে বসে বসে টিভিতে ঘ্যানঘ্যানে হিন্দি সিরিয়াল দেখার চেয়ে বাইরে যাওয়াটাই ঠিক করল সে। বাড়ির একমাত্র টিভিটা বোনেরা বউদিকে ছেড়ে দিয়েছে। শ্রাবন্তী বসে পড়েছে যথারীতি।

মা আবার রান্নাঘরে লেগে পড়েছে। রূপম ধীর পায়ে রান্নাঘরে ঢুকল। মা বেগুন কাটছে, রূপম বলল, "রূপসী নেই? তুমি তো একাই করে যাচ্ছ দেখছি।"

মা হাসল। বলল, "পড়বে না নাকি রে? তুই জামাকাপড় চেঞ্জ করলি যে? বেরোবি কোথাও?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ, ক্লাবে যাব ভাবছি।"

মা ক্লাবে যাবার নাম শুনে খুশি হল না। বলল, "দেখিস, পার্টি নিয়ে কোনও কথা বলিস না। এখন সময় ভালো না। কে কখন কোথায় গিয়ে লাগিয়ে দেয়। খাদ্য সুরক্ষা নামে এক নতুন জিনিস শুরু হয়েছে, জানিস আমাদের বাড়ির নামই তোলেনি। তোর ওই বন্ধু, কী নাম যেন, হ্যাঁ বাপ্পা। ওকে তোর বাবা গিয়ে ধরল। বলে কিনা, কাকু বুবাই তো বিরাট চাকরি করছে। কী দরকার। অথচ ওরা নেতা। ওদের যা আয় তাতে তোর পাঁচবার মাইনে হয়ে যাবে। কে বোঝাবে বল এসব?"

রূপম বলল, “খাদ্য সুরক্ষা হোক আর যাই হোক, সেসব নেবার দরকার কী আছে? আমি যা পাঠাই তাতে হচ্ছে না?”

মা বলল, “হয়, কিন্তু সবাই পাবে, আমরা কেন বাদ যাব বলতে পারিস? ছেলে বাইরে চাকরি করে, কলকাতার মেয়ে বিয়ে করেছে, সবার চোখ টাটায় এটা বুঝিস না?”

রূপম হেসে ফেলল, “মা তোমার গর্ব হয়, না?”

মা-ও হাসল। “হবে না? ক-টা ছেলে আছে পাড়ায় তোর মতো? ওই তো একটা সেই ব্যানার্জিবাড়ির ছেলেটা। কিন্তু ওর পেছনে ওর বাপ মা কত খরচ করেছিল সেটা ভুললে হয়? আর তুই তো সব নিজের স্কলারশিপের টাকাতেই পড়েছিস। বাকিগুলো সব কেউ নেতার চামচা, কেউ এর ওর তার সাথে ঝগড়া করে ঘুরে বেড়ায়। গর্ব তো হবেই।”

রূপম বলল, “তাহলে ওদের কিচ্ছু বলার দরকার নেই। উপেক্ষা করো। ওদের কাছে হাত পাততে হবে এত খারাপ দিন আমাদের আসেনি।”

মা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “এই বয়সে এত চাপ নিস কী করে? এত বড়ো একটা সংসারের বোঝা নিয়ে চলছিস, পারবি? তার থেকে আমরা এই করে যদি কিছু করতে পারি সেটাই ভালো হবে।”

রূপমের একটু খারাপ লাগল। শ্রাবন্তী কি মাকে ঠারেঠোরে কিছু শুনিয়েছে? মা তো কোনওদিন এইসব কথা বলত না! সে শক্ত হল। বলল, “দ্যাখো মা, আমি ওইসব বুঝি না। চাপ নিতে হলে নিতে হবে। আমি তো বাড়িরই ছেলে। আমি আরামে থাকব আর তোমরা ওই বাপ্পাদের মতো চামচাদের ধরে রেশনের চা খেয়ে বাঁচবে সেটা হতে দেব না। সে যে যাই বলুক।”

মা হাসল, "সত্যি, তুই সেই রকমই রয়ে গেলি। যাহ্, ঘুরে আয়। আমি আর কাউকে কিছু বলছি না। খুশি?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। খুশি। আমি বেরোলাম।"

মা বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরিস।"

রূপম ভাবছিল কোনও কোনও জিনিস কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না। সে যখন বিকেলে খেলতে যেত তখনও মা এভাবেই বলত তাড়াতাড়ি ফিরিস। আর আজকেও... টিভির ঘর দিয়েই বাইরে যাবার দরজা। রূপমকে বেরোতে দেখে শ্রাবন্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। রূপম বলল, "আসছি ঘুরে। তুমি টিভি দ্যাখো।"

বাবার দিকে একবার তাকিয়ে কোনওমতে হাসি চেপে বাইরে বেরোল সে। বাবা বউমার সামনে একেবারে তটস্থ হয়ে বসে আছে। টিভির দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে। এমনি সময় সে বা বোনেরা টিভিতে সিরিয়াল দেখলে বাড়ি মাথায় করে তুলত। এখন চুপচাপ বসে বউমার সাথে সিরিয়াল দেখছে।

ক্লাবের দিকে রওনা হতেই তার দেখা হয়ে গেল বাপ্পার সাথে। তাকে দেখে বাইক আস্তে করল। বেশ একটা হোমরাচোমরা ভাব এসেছে। বাপ্পাকে তারা ছোটোবেলায় শালিখ বলে ডাকত। শালিখ নামটা বাপ্পাদের পারিবারিক নাম। সে শুনেছে বাপ্পার বাবাকেও তার বাবা শালিখ বলে ডাকত। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নাম বলা যেতে পারে। বাপ্পা দাঁড়াতেই সে ঠিক করল সেই নামেই ডাকবে। মা-র কাছে খাদ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কথা শুনে তার বেশ রাগ হচ্ছিল। সে হাসতে হাসতেই বলল, "কী রে শালিখ, কেমন আছিস?"

বাপ্পার বাইকের পেছনে মনে হয় একটা চামচা বসেছিল। এই ডাকটা শুনে সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বাপ্পা ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইল হেসে, "আহ গুরু, তুমি এখনও সেই ছোটোবেলাতেই আছ দেখছি।"

রূপম বলল, "হ্যাঁ তুই যে নেই সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। ন্যাতা হয়েছিস নাকি?"

বাপ্পা অপ্রস্তুতের মতো হাসল, "হে হে, গুরু, ওসব কিছু না, সোশ্যাল সার্ভিস আর কি। আগের পার্টি তো সব শেষ করে দিয়ে গেছে, তাই আমাদেরই একটু বেশি দায়িত্ব নিয়ে দেশটা বাঁচাতে হচ্ছে বুঝতেই পারছিস।"

রূপম হাসল, "হ্যাঁ তা তো বুঝতেই পারছি। তা ব্যবসা কেমন চলছে?"

বাপ্পা দাঁত বের করে হাসল, "তা গুরু ভালোই। সবই সোশ্যাল সার্ভিস কি না। যাক গে, তুই বাইকে ওঠ। এই ঘোৎনা, তুই হেঁটে আয়, আমি ক্লাবে যাব।"

রূপম দেখল পেছনের চামচাটাকে নামিয়ে দিল বাপ্পা। সে চুপচাপ বাপ্পার বাইকের পেছনে গিয়ে উঠল। মজাই লাগছিল তার শালিখের সঙ্গ। কেমন একটা হনু হনু ভাব, আর তলায় বইছে একটা জোকারির মলয় বাতাস।

৭ মিলি

দিদি মোবাইলটা খুটখুট করছে। আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে ওকে দেখছি শুধু। ওর সঙ্গে এমনভাবে মিশতে হবে যেন ও জানতেও না পারে ও কী করে বেড়াচ্ছে সেটা আমি জানতে পেরে গেছি।

করছে বলতে অবশ্য সেরকম কিছুই করেনি। অয়নদার সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো পড়তে যায়, মধুমিতা ফলো করবে কাল থেকে। খেলার নিয়ম পরিষ্কার। দিদি এখন আমার শত্রু। আর মধুমিতা যতই শয়তান হোক, এখন আমরা বিক্ষুব্ধ শ্রেণি। আমাদের হাত মেলাতেই হবে।

দিদির মোবাইল আজ আরও একবার ঘাঁটার সুযোগ পেয়েছি। ও যখন স্নানে গেছিল। বেশ কয়েকবার চেক করে নিয়েছি। অয়নদার সাথে বিরাট কিছু কথা হয় না। কিন্তু বেশ কিছু কথা অনেক কিছু মিন করে।

যেমন –

অয়নদা- আজ কলেজের পরে দাঁড়াস। কথা আছে।

দিদি- বটগাছ।

এরপরে শুধু অয়নদার একটা স্মাইলি, তাও হাসি হাসি মুখওয়ালা। এর থেকেই বোঝা যায় এদের মধ্যে একটা গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। কলেজের পরে কোথায় দেখা হবে একগাদা কিচ্ছু লেখেনি। দিদি শুধু বটগাছ লিখেছে তাতেই দুজনে যা বোঝার বুঝে গেছে। হাইলি সাসপিশাস ব্যাপার, মানতেই হবে। তবে আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়! আমিও আমার ফোন থেকে অয়নদাকে একটা জোক পাঠিয়ে দিলাম।

ইন্টেলেকচুয়ালওয়ালা। ননভেজ পাঠাই না কোনওদিন। মধুমিতা প্রচুর ননভেজ জোক পাঠায়, কোনও-কোনওটা পড়লে রীতিমতো গা ঘিনঘিন করে। সেগুলো পড়েই অবশ্য ডিলিট করে দিই। দিদির চোখে পড়লে দিদি যদি মাকে বলে দেয় তাহলে আর দেখতে হবে না। মা এখনও আমাকে মাঝে মাঝে দু-চার ঘা দিয়ে দেয়। বড্ড লাগে। আমারও একটা প্রেস্টিজ আছে। আমি যে এখন বড়ো হয়ে গেছি মা সেটা বুঝতেই চায় না। ওদিকে নিজেই বলে মেয়েদের শরীর খারাপ হয়ে গেলে মেয়েরা বড়ো হয়ে যায়। দিদিকে মা আমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসে। সেটা আমি বুঝতে পারি। বাসুক। আমাকে কাউকে ভালোবাসতে হবে না। অয়নদা ভালোবাসলেই হবে।

বাবা টিভির ঘরে বউদির সাথে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে। বেচারা অন্যান্য দিনগুলিতে এই সময় নিউজ চ্যানেলগুলি খুলে বসে থাকে। আজকে সেটাও করতে পারছে না। দিদিকে বললাম, "এই দি, চ' বাবাকে একটু জ্বালিয়ে আসি।"

দিদি চোখ পাকিয়ে তাকাল আমার দিকে, "খুব মজা না? যা না, বউদির ওখানে গিয়ে তুই বস না। বাবা বরং একটু ঘুরে আসুক। ওখানে বউদির সঙ্গে কাউকে না কাউকে তো বসতেই হবে। আমরা বসতে পারব না বলেই তো বাবা বসেছে।"

আমি মাথা নাড়লাম জোরে জোরে, "না না, আমার কাল পরীক্ষা আছে টিউশনে। একটা কাজ কর না, তুই-ই যা তাহলে।"

দিদি রেগে গেল, "তাহলে চুপচাপ পড়ে যা। সার্কাস দেখতে হবে না। মাকে ডাকব?"

আমি আর দিদির দিকে তাকালাম না। জোরে জোরে পড়তে লাগলাম। দিদিটা এমনি ভালোমানুষ আছে। কিন্তু বাবাকে কিছু বললেই রেগে যায়। বাবার ন্যাওটা একটা। আমি অবশ্য ছটফট করছি একবার দেখে আসি বউদির সামনে বাবা কী করে সেটা দেখতে।

আজকে সকালে অবশ্য একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। লুচি নিয়ে বউদি কোনও অভিযোগ করেনি। বরং চারটে দিয়েছিল মা প্রথমে, চেয়ে নিয়েছে আরও দুটো। খাওয়াদাওয়ার পরে আমাদের সবাইকে অবাক করে মাকে বলেছে ইলিশমাছ রান্না শিখতে চায়। দাদা অবশ্য সেসব শুনে কেশে-টেসে একশা করেছে। তাতে আবার বউদি রাগও করেছে। তবে দাদার উপর বউদি রাগ করলেও সেটা আমাদের সামনে বেশি দেখায় না বউদি। বেশ সবার সামনে হাসি হাসি মুখ করে থাকে। আমার সেটা কেমন যেন লাগে। এত ভদ্রতাও মাঝে মাঝে চোখে লাগে।

খানিকক্ষণ পড়লাম। কিন্তু আর ইচ্ছা করছিল না।

দিদিকে আবার খোঁচাতে ইচ্ছা হল, "কী রে? একটা বিশ্বস্ত জায়গা থেকে শুনলাম তুই নাকি প্রেম করছিস?"

দিদি রেগে গেল, "আমি মাকে ডাকি?"

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, "ডাক না। মাকেও বলি তাহলে?"

দিদি একটু শান্ত হল যেন, "কে এই সব ফালতু কথা তোকে বলে?"

আমি মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। "সত্যি কি না বল।"

দিদি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভালোই রেগেছে মনে হচ্ছে। মোবাইলটা ফেলেই গেছে। আমি আবার হাতালাম ফোনটা।

৮

ক্লাবটা যে মোটামুটি পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে, রূপমের এ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। ক্লাবের মধ্যেই ভোটের জিনিসপত্র সব ডাঁই করে রেখেছে বাপ্পারা। ভেবেছিল ক্লাবে ঢুকে নস্টালজিক হবে, সেটা আর হওয়া হল না। বাপ্পা এসেই তাকে হঠাৎ করে খুব খাতির করে সবাইকে "এই আমাদের গুরু এসেছে রে" বলে ডেকে নিল। বেশিরভাগ মুখই অপরিচিত। কারও কারও চেহারা দেখেই বোঝা যায় স্বাভাবিক নিয়মে জীবনযাপন করার পাবলিক এরা কেউই নয়।

তাকে ঘিরেই মোটামুটি সব বসল। বাপ্পা বলল, "গুরু তুই তো ঘ্যাম চাকরি করছিস! আমাদের পার্টি ফান্ডে কিছু দে!"

পাপনও ছিল ওখানে। বাপ্পার কথা শুনেই তেড়ে উঠল, "ছেলেটাকে একটু বসতে দে। আসতেই নিজের ধান্দার ঝুলি খুলে বসলি?"

পাপনের সঙ্গে চিরকালই রূপমের বেশি জমত, সে পাপনের কথা শুনে হেসে ফেলল, "বাপ্পাটা বহুত ধান্দাবাজ হয়ে গেছে বল? আর এটা তো আমাদের পাড়ার ক্লাব। এখানে পার্টির কথা আসছে কেন হঠাৎ?"

বাপ্পা দেঁতো হাসি দিল তার কথা শুনে। বলল, "আহ গুরু, তুইও না তেমনি। ক্লাবে একটু ওসব রাখতে হয়। তুই বুঝবি না। গরমেন্টের অনেক গ্র্যান্টের ব্যাপারস্যাপার আছে। সেগুলো তো ক্লাবের কাজেই লাগছে নাকি? এই দেখ না, গত মাসে কম্বল বিতরণ করে ফেললাম।"

রূপম অবাক হল, "এই গরমের মধ্যে কম্বল দিয়ে কী হবে?"

বাপ্পা আক্রমণাত্মক হবার চেষ্টা করল, “কম্বল কত কাজে লাগে জানিস? যারা ফুটপাথে থাকে তাদের তোশকের কাজও করে।”

রূপম হাত তুলে থামতে বলল বাপ্পাকে, “ঠিক আছে। আমি এই ব্যাপারে আর কিছু বলব না। যা ভালো বুঝিস কর। এলাম ক্লাবে পুরোনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে, আর কিছুই মিলছে না দেখছি।”

বাপ্পা আহত গলায় বলল, “এরকম করে বলিস না। আমি কি তোর বন্ধু না? পাপনও তো আছে।” রূপম বলল, “বন্ধুর থেকে তোকে শাসক বেশি মনে হচ্ছে আজকে।”

পাপন ফুট কাটল, “ও তো এখন পুরোদমে নেতা-ই রে। পরের বার কাউন্সিলরে দাঁড়াচ্ছে।”

বাপ্পা পাপনের দিকে একটা আগুনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, “ফালতু কথায় কান দিস না, আমি মানুষের সেবাই করে যেতে চাই বাকি জীবনটা।”

রূপম আর কিছু বলল না। মা-র কথাটা মনে পড়ে গেল। এখানে এখন একটা অদ্ভুত সময় চলছে। কোনও কিছুই নর্ম্যাল না। সবাই কেমন তেতে থাকছে। সবাই কিছু একটা হবার চেষ্টা করছে। সোজা পথে চাকরি হবার রাস্তাঘাট বন্ধ প্রায়। পুরোটাই বাঁকা পথে সমাজসেবা টাইপ ডায়লগ মেরে কেমন একটা পাবলিক গিমিকের চেষ্টা।

পাপন বলল, “তুই আছিস ক-দিন?”

রূপম বলল, “সাত দিন। অফিসে ছুটির হাল খুব খারাপ আসলে। পুজোয় তো আসতেই পারলাম না। এলাকার খবর কী রে?”

বাপ্পা দাঁত বের করল, "ফাইন। একদম ঝাক্কাস।" বাকি ছেলেগুলি তাদের কথোপকথন শুনছিল, কেউ কোনও কথা বলছিল না। ওদের শীতল চোখগুলির দিকে তাকিয়ে রূপমের হঠাৎ একটু অস্বস্তি হওয়া শুরু হয়েছিল। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। পাপন বাপ্পার কথা শুনে মুখ কুঁচকোল, "ফাইনই বটে। মাঝে মাঝেই লাশ পড়ছে। ছ-সাত মাস পর পর রেপ হচ্ছে, ফাইন ফাইন।"

বাপ্পা পাপনকে একটা ধমক দিল, "ফালতু কথা বলবি না। আমাদের প্রতাপনগর কি ভারতের বাইরে? সব জায়গায় যেরকম রেপ মার্ডার হয়, এখানেও হয়। বিহারে ইউপিতে এর থেকে অনেক বেশি হয়। আর তোরা এই রেপ মার্ডার আগের আমলে দেখিসনি? সব কি এই আমলেই হচ্ছে?"

পাপন ছাড়ল না, "সব আমলেই হয়েছে। কিন্তু এরকম বুক বাজিয়ে কোনও গুন্ডাকে নেতাগিরি করতেও দেখিনি।"

বাপ্পা বলল, "দেখ পাপন, এখানে ও এসেছে। আবার শুরু করিস না প্লিজ। তুই আমার বন্ধু বলে এসব বলে পার পেয়ে যাস। আমাদের দলের ছেলেরা যথেষ্ট কথা শোনে আমার তাই। আমি কিন্তু সবসময় তোকে বাঁচাতে পারব না এটা মনে রাখিস। কখন কোন অন্ধকারে মারধোর খেয়ে যাবি, তখন তো আবার কাঁদতে কাঁদতে সেই আমার কাছেই আসতে হবে তোকে।"

রূপম চমৎকৃত হল। বাহ। বাপ্পার তো প্রচুর উন্নতি হয়েছে!!!

৯ মিলি

বাড়ির সামনে কদিন ধরে একটা পাগল আস্তানা গেড়েছে। কোত্থেকে এসেছে কে জানে। বসে থাকে চুপচাপ আর পাড়ার কুকুরগুলি সব তাড়া করে। বউদি একবার দেখেই আমাকে বলে দিয়েছে এইসব ওদের ওখানে ভাবাই যায় না। ট্রেসপাসারস ইত্যাদি নাকি ওদের অ্যাপার্টমেন্টের গেটে ঢুকতেই পারে না। ওরা যেদিন এল সেদিনই আমাদের পিছনের বাড়িতে বিরাট ঝগড়া লেগেছিল। আমাদের মফস্সলে এইসব স্বাভাবিক ঘটনা। বউদি সেটা দেখেও বেশ কয়েকবার বিরক্তি প্রকাশ করেছে।

আমার তো ঝগড়া দেখতে চরম লাগে। একবার যদি দেখি ঝগড়া লেগে গেছে, টুক করে ছাদে চলে যাই, একটু আচার ম্যানেজ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। কতরকম নতুন নতুন গালাগাল যে শেখা যায় তার তো সীমা নেই কোনও। বোকাচোদা শব্দটা এই ঝগড়া থেকেই শিখেছিলাম। তখন আমি ক্লাস ফাইভ। দিদির সাথে কী একটা নিয়ে লেগেছিল, মা-ও ছিল ঘরে, আমি দিদিকে "বোকাচোদা" বলে দিয়েছিলাম। মা সেটা শুনে কী মার যে মারল, আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি কেন মেরেছিল। পরে মধুমিতা শিখিয়ে দিয়েছিল বোকাচোদা মানে কী। শুনে ফিকফিক করে অনেকক্ষণ হেসেছিলাম আর মা-র সেই মারটা মনে পড়ে গেছিল। মধুমিতা অবশ্য আমাকে অনেক গালাগালির মানেই শিখিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে সব ক-টার সন্ধিবিচ্ছেদ। তবু বাড়ির পিছনে এই সাহাবাড়ির ঝগড়াটা হলেই আমি কান খাড়া করে আমার গালাগালির ভোকাবুলারি বাড়ানোর চেষ্টা করে যাই। ক্লাসে তো সবই নিরিমিষ গালাগালি শুনতে পাই। এখানে

মাঝে মাঝে কয়েকটা কড়া জিনিস শোনা যায়। খানকির ছেলে এদের কাছে নার্সারির গালাগালি। কতরকম যে এদের স্টকে আছে কে জানে!

এদের বাড়িতে তিন ভাই। মা আর বাবা থাকে। এরা সব একসাথেই থাকে। এমনিতে এদের বাড়িতে নিজেদের মধ্যে বিরাট গলায় গলায় ভাব। বাইরের লোকে এক ভাইয়ের কিছু করলে বাকি দু-ভাই পারলে খুন করে আসে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের মাঝেমধ্যেই লাগে। বিষয়গুলিও হাইফাই। একদিন বড়ো ভাইয়ের পাতে মাছ কেন ল্যাজার পিস দিয়েছিল মেজো বউ, সে নিয়ে লাগল। তখন আমি পরীক্ষার পড়া করছিলাম। এদের ঝগড়া শুনে ছাদে গিয়ে দেখছি বড়ো বউ আর মেজো বউ ঝাঁটা নিয়ে উদোম গালাগাল শুরু করেছে, মেজো ভাই বড়ো ভাই আর ছোটো ভাই মিলে তাস খেলছে। তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই যে এত বড়ো ঝগড়া লেগেছে কোথায় সামলাবে! মানে চাপের যেন কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ইতিহাস মিলিয়ে খুঁজে পেলাম না এরকম কেস কেউ কোনওদিন দেখেছে নাকি! শেষে আর চাপ না নিয়ে নিচে চলে এলাম। ভাইদের মধ্যেও লাগে। তাস খেলা নিয়ে। বিরাট হাতাহাতি। তখন আবার দেখেছি বউরা সেসব ব্যাপারে বেশি নাক গলায় না। মানে টোটাল ডেমোক্রেসি আর কি!

এদের ঝগড়া বাঁধলে পাগলটা এদের বাড়ির সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দাড়ি-টাড়ি চুলকায়। একা একা লাফায়। মাঝে মাঝে আমি পাগলটাকে খাবারও দিতাম। তারপর দিদি যখন বলল পাগল-টাগলদের কাছে বেশি না ঘেঁষতে, এদের নাকি হুট করে শরীরে হাত দেবার প্রবণতা থাকে; তারপর থেকে আর দিই না। শরীরে হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য পাগলদের থেকে ভদ্রলোকেরা কোনও অংশেই পিছিয়ে থাকতে দেখিনি। বাসে উঠলেই ছুতোনাতায় পেছনে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কখনও কনুইটা বুকে

ছুঁইয়ে ফেলে, এমন একটা ভাব যেন পুরো ব্যাপারটাই অ্যাক্সিডেন্টালি ঘটছে। জেনেবুঝে করেনি। আমি অবশ্য ছোড়নেওয়ালির মধ্যে পড়ি না। একদিন একটা বুড়ো মাল বাসের মধ্যে হঠাৎ বুকের মধ্যে কনুইটা ঠেকিয়েছিল আর আমি দিয়েছিলাম এক চিৎকার, "দাদু কনুইটা ইচ্ছা করেই তোলো নাকি? খালি বাসেও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়?" বাসের বাকিরা বুড়োটাকে ভালোমতোই দিল। বুড়োটা দেখলাম হে হে করতে করতে পরের স্টপেজে নেমে গেল।

হারামি আর কাকে বল। ইশ, বাজে ভাষা বেরিয়ে গেল। মা শুনলে এবার আমার সব চুল কেটে ছোটো করে দেবে।

১০

দোকানের ছেলেটার হাতটান আছে। নারান ওকে চোখে চোখে রাখে। একটু চোখের নজর এদিক-ওদিক হলেই খুচরো-টুচরো যা পায় পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। সবসময় বকাঝকা দেওয়া সম্ভবও না। বাজারে সবাই তাকে বোকাসোকা দোকানদার হিসেবেই চেনে। দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসলে বিকেলে ছ-টার সময় চা ফ্রিতে পাওয়া যায় বলে অনেকে বসেও। চারদিকের গল্পসল্প হয়। দেশের বিভিন্ন কথাও আলোচিত হয়। নারান ভালোমানুষের মতো মুখ করে সবই শোনে।

রেপ নিয়ে আলোচনা অনেকদিন হচ্ছে না। কারণ বেশ কয়েকদিন সেটা বন্ধ আছে। এখন কথা হচ্ছে এলাকায় পলাশের ফিরে আসা নিয়ে। সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পলাশ নাকি বাঘের বাচ্চা। দেবু হালদারকে তুলে নিয়ে গেছে। ক-দিন পরে নাকি লাশ পাওয়া যেতে পারে।

নারান জানে এসব যত বেশি হবে তত ভালো। লোকের ধ্যান সব এইসব রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে থাকবে। সে কী করে বেড়াচ্ছে কেউ তত খোঁজ রাখবে না। অথবা ভাবতেই পারবে না। রেপের ক্ষেত্রে সবাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের পাবলিকদেরই সন্দেহ করে। এমনিতেই কচি বয়সের ছেলেপুলেই দলগুলিতে বেশি থাকে। তাদের গায়ের রক্ত বেশি গরম থাকে। নারান জানে, ওদের রক্তে উত্তেজনা থাকলেও ওদের ভুল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কোনওরকম হোমওয়ার্ক ছাড়াই ওরা মাঠে নামে। এসকেপ প্ল্যান থাকে না। খুব সহজে ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়ে যাবার পর লোকলজ্জা কিংবা মিডিয়ার ভয়ে রাজনৈতিক দলের হাত ওদের মাথার ওপর থেকে

সরে যায়। ওরা যতটা আনন্দে এই অপরাধ করে, জীবন ততটাই দুর্বিষহ হয়ে যায়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এইসব করে বুক চিতিয়ে চলাফেরা করা পাবলিকও আছে। তবে তাদের বাপের প্রচুর পয়সা। নেতা থেকে শুরু করে মেয়ের বাপ সবাইকেই কিনে নেয় তারা। কেউ টাকায় বিক্রি হয়, কেউ হয় ভয়ে।

নারান এইসবের কোনওখানেই তাই থাকতে চায় না। কাজ যেখানে শুরু হবে সেখানেই শেষ হবে। মাঝখানে কোনও কিছু ফেলে রাখার পক্ষপাতী সে নয়।

সন্ধেবেলা দোকানে বসে হিসাব মেলাতে বসেছিল নারান। শ্যাম্পুর স্যাশের হিসেব মেলাতে অনেকক্ষণ সময় লেগে যায়। একটু চোখের আড়াল হবার জো নেই, দেড় টাকা, তিন টাকা চোখের নিমেষে নিজের পকেটে চালান করে দেয় ছেলেটা। দোকানের সামনে কয়েকজন বয়স্ক লোক প্রতিদিনই বসে, তাদের কথাই কানে আসছিল মাঝে মাঝে, একজন যেমন বলছিল, "ভোটের সময় বাপু একটু শান্তিতে থাকা যায়, সবাই কেমন তেল মারে দেখবে এসে, এরকম সারাজীবন যদি ভোট থাকত তাহলে তো ভালোই হত, কী বলো?"

আর-একজন বলল, "যা বলেছ, তবে আমাদের পাড়াতে আবার অত শান্তিও নেই। মাঝে মাঝেই হুমকি শুনতে হচ্ছে। ওই যে তোদের ওই কী যেন নাম হাতকাটা পল্টু না কী, ব্যাটা এখন থেকেই বলে দিচ্ছে ভোটের দিন যেন একটু বুঝেসুঝে ভোট দিই। আমি তো আবার বলেই দিয়েছি, চিন্তা কোরো না বাপু, আমি তো তোমার দলেরই লোক, শুনে কোথায় ভাবলুম খুশি হবে, বলে কিনা, তাহলে কাকু এ বছর চাঁদাটা একটু বাড়িয়েই দিয়েন, অনেক এক্সটারনাল সোর্স তো বন্ধই আছে। বোঝো।"

এর কথা শুনে চারদিকে খুকখুক করে একটা হাসি উঠল। নারান মনে মনে একটা গাল দিল। মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী পাবলিক সব। সুবিধা নেওয়ার সময় আমি তোমাদেরই একজন, আর একটু এদিক-ওদিক হলেই গালাগাল স্টার্ট। ঠিকই করেছে ছেলেটা বেশি চাঁদা চেয়ে। এদের এরকমই শায়েস্তা হওয়া দরকার। এর একটা নাতনি আছে। বেশ ভালো ফিগার। নারান চোখ বন্ধ করে গোটা শরীরটা একবার কল্পনা করে নিল। বেশ কয়েকবার আলতো নজরে লক্ষ রেখেছে সে। কলেজ থেকে ফেরার সময় কেউ না কেউ সবসময়েই সাথে রাখে। একজন থাকলে সেই লক্ষ্যকে বাতিলের খাতায় রাখার নিয়ম নারানের। কিন্তু হয় না, রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়ে যায় নগ্ন শরীরটা মাথায় চলে এলে।

দুটো মেয়ে হাসতে হাসতে তার দোকানে ঢুকল। সামনের বুড়োদের ভিড়টা একটু নড়েচড়ে বসল। নারান আবার মনে মনে খিস্তি মারল। শালা চুলগুলো একটাও কাঁচা নেই, তবু কচি মেয়ে দেখলে সবারই মনের ভিতরে মরূদ্যান তৈরি হয়, ধর্ষণের ইচ্ছা সবারই থাকে, শুধু ধক থাকে না সবার এই যা।

এই বয়সের মেয়েগুলি সবকিছুতেই হাসে। কারণে হাসে, অকারণে হাসে। দুটো মেয়েরই ফিগার বেশ ভালো, তবে একজনেরটা তার রাতের ঘুম ভুলিয়ে দেবার পক্ষে আদর্শ। এলাকায় নতুন মনে হচ্ছে। অথবা তার দোকানে এই প্রথম এল। এসেই দিব্যি দোকানের ছেলেটার কাছে একটা লিস্ট দিয়ে দিল, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিল। নারান চোখ বন্ধ করে ওদের কথায় কনসেন্ট্রেট করল। দুটো নাম কানে এল, মিলি, আর মধুমিতা।

কোন মেয়েটার নাম কোনটা, সেটা বুঝতে এবার চোখ খুলল সে।

১১ মিলি

অয়নদার সব ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর মুখে জ্ঞান দেওয়া শুরু করে যে কী বলব। দিব্যি ছিলাম, বাইরে গেছিলাম, ফিরে অয়নদার গলা শুনে খুশিই হয়েছিলাম, কিন্তু ও হরি!

ব্যাটা এসেই দিদির সাথে তুমুল তর্ক জুড়ে দিল। কী নিয়ে শুরু হয়েছিল জানি না, কারণ তখন বউদি কীসব কিনতে দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এসে দেখছি হুলস্থুল কাণ্ড। পৃথিবীর নাকি যা গর্ব, সবই আসলে গরিব শ্রমিকদের শোষণ করে গড়ে উঠেছে। পিরামিড থেকে তাজমহল, আসলে দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু এর পিছনে যে কত লোকের রক্ত আছে সেটা আমরা ভুলে যাই। দিদি যতই বলে, তুই সবকিছু এত গরিব লোকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটা তর্কও করতে পারে। দিদির কথা শুনে বলে, "তুই থাম, গরিব লোকের কথা ভুলব মানে? গরিব লোক সব জোগান দিয়ে যাবে আর আমরা সেটা ভোগ করে যাব? আমরা তো নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবু গরিব লোকেদের কথা আমরাই ভুলে যাই কেন?"

দিদি একেবারেই ঝগড়া করতে পারে না। ঝগড়া করতে গেলে দিদির কান মাথা সব লাল হয়ে যায়। অয়নদা যদিও আমার জান, তবু, দিদিকে এই অবস্থায় দেখে আমি খুব একটা খুশি হতে পারলাম না। কিন্তু আমিও যুক্তি খুঁজে পাই না। শেষমেষ আমি আর দিদি চুপচাপ বসে থাকলাম আর অয়নদা যত দুনিয়ার গরিব মানুষদের নিয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখি অয়নদা চুপ করে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কখন যেন বউদি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়।

বউদি বলল, “রূপসী, ও তোর সাথে পড়ে?”

দিদি মাথা নাড়ল। আমি খুব উত্তেজিতভাবে ইন্ট্রো দিতে গেলাম, “জানো বউদি, অয়নদা খুব ভালো পড়াশোনায়, যে-কোনও সময় বিদেশে রিসার্চ করতে যেতে পারে।”

বউদি বলল, “মিলি তুই একবার শুনে যা।”

বউদি বলেই নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল। আমি একবার দিদির দিকে একবার অয়নদার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বউদির ঘরের দিকে গেলাম। দাদার ঘরে ঢোকার পরে বউদি দরজা ভেজাতে বলল আমায়। দাদা এখন বাড়ি নেই। কোথাও একটা বেরিয়েছে। পাড়াতেই হয়তো।

দরজা ভেজানোর পরেই বউদি যেন খুব বড়ো কোনও কথা বলবে এভাবে আমাকে ফিসফিস করে বলল, “এখানে তোদের ঘরে একটা ছেলে চলে আসছে, তোর বাবা মা কেউ কিছু বলে না?”

আমি বউদির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এটা নিয়ে তো কোনওদিনই আমরা ভাবিনি। অয়নদা যখন ফাইভে পড়ে তখন থেকেই আমাদের বাড়ি আসে। বাবা বা মা-ও তো এটা নিয়ে কোনওদিন ভেবেছে বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, “না, ও তো বন্ধু। দিদির বন্ধু। তা ছাড়া খুব ভালো পড়াশোনায়।”

বউদি বিরক্ত গলায় আমাকে থামাল, “বন্ধু মানে কী? বন্ধু বলে আবার কিছু হয় নাকি? একটা বয়সের ছেলে তোদের ঘরে ঢুকবেই বা কেন? স্ট্রেঞ্জ!”

আমি অবাক হলাম। বউদি তো কনভেন্টের স্টুডেন্ট। ওদের আবার এত সমস্যা থাকে নাকি ছেলেমেয়ে নিয়ে? নাকি আমাদের বাড়িতে একটু বেশি গার্জিয়ানগিরি ফলাচ্ছে?

অয়নদাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কোনওদিন যে কোনও সমস্যা হতে পারে সেটাই আমার কোনওদিন মাথাতে আসেনি।

আমি বললাম, "অয়নদাকে কিন্তু তুমি যেরকম ভাবছ সেরকম না।"

বউদি গলা নামিয়ে বলল, "ওরকম তোরা ভাবছিস। কত বদনাম হতে পারে সে খেয়াল আছে? লোকে কত কথা বলবে তোদের নামে, তোদের বিয়ে দেওয়াটাই চিন্তা হয়ে দাঁড়াবে একসময়।"

আমার ভীষণ হাসি পেল। মধুমিতা একটা কথা বলে আজকাল খুব। কিছু হলেই এই কথাটা বলে। এখন খুব সেই কথাটা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বললে বউদির মুখটা কেমন দাঁড়াবে সেটা ভেবেই আমার পেটের ভিতরটা গুড়গুড়িয়ে উঠছিল। কথাটা আর কিছুই না, সেটা হল "বউদি, তোমায় দেয় কে?"

১২

জীবনটা আসলে সিনেমা না। তাই কোনও কোনও গল্প শেষ হয়ে গেলেও সেটা ফিরে ফিরে আসে। যে অস্বস্তিকর অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবে সবাই, জীবনে সেটা হয় না। নইলে মোমের সাথে দেখা হবার কোনও মানে হয়?

সে বেরিয়েছিল সন্ধেবেলায় হাঁটতে। ক্লাবে গতকাল যাবার পর থেকে ভুলেও ভাবেনি আর যাবার কথা। যেখানে শুধু রাজনীতি ছাড়া আর কিছু হয় না সেখানে যাওয়ার কোনওরকম স্পৃহা তার আর ছিল না। ঘরে থাকতেও ইচ্ছা করে না। একা একাই হাঁটতে বেরিয়েছিল। অনেকদিন পরে নিজের মফস্সলে নিজেকে আবিষ্কার করছিল সে। এই রাস্তা দিয়েই সে পড়তে যেত, সেই মুদির দোকানটা, সব একইরকম আছে। অচেনা মানুষও চোখে পড়ছিল। কেউ অনেক ছোটো ছিল, বড়ো হয়ে গিয়ে কেমন একটা দেখতে হয়ে গেছে। কয়েকজন এসে পরিচয় দিয়ে গেল, কেমন আছে জানতে চাইল, সে কথা এগোচ্ছিল না, দেঁতো হাসি দিয়ে এক-আধটা কথা বলে কাটিয়ে যাচ্ছিল।

মোমের মুখোমুখি হল মোমের বাড়ির সামনেই। তার অবচেতনে যে মোমকে দেখার ইচ্ছা ছিল না সেটা সে অস্বীকার করতে পারে না কখনোই। কিন্তু মোমের বাড়ি ফেরার সময়ই মোমের সাথে দেখা হওয়াতে একটু অপ্রস্তুতই হল সে। মোমই তাকে দেখে এগিয়ে এল, সে ভেবেছিল তাকে হয়তো না দেখার ভান করে চলে যাবে।

মোমই প্রথম কথা বলল, "আরে তুই? ভালো তো?"

রূপম হাসল, "হ্যাঁ, তুই?"

মোম বলল, "দারুণ! বউ কেমন?"

রূপম হাসিটা বজায় রাখল, “ভালোই। তুই বিয়ে করলি?”

মোম হেসে ফেলল, “নাহ। বিয়ে করার সময় পাইনি এখনও।”

রূপম বুঝতে পারছিল না এরপরে কী বলবে। অনেক ভেবে বলল, “দাদার বিয়ে হয়েছে?”

মোম বলল, “হ্যাঁ, আগের বছর। আয় ঘরে আয়।”

রূপম কাটাতে চাইছিল কিন্তু একটা অদ্ভুত চুম্বকের কারণে সে না করতে পারল না। মোমের পিছন পিছন ওদের বাড়িতে ঢুকল সে।

মোমকে তালা খুলতে দেখে সে বলল, “কেউ নেই বাড়িতে?”

মোম বলল, “নাহ। মা দাদার কাছে আছে।”

রূপম উদ্বিগ্ন গলায় বলল, “এখন চারদিকে যা চলছে তুই এই বাড়িতে একা থাকিস কী করে?”

মোম হাসল, “আমি মনে হয় যমেরও অরুচি”, ঘরে ঢুকতে গিয়ে ছোটো বারান্দায় মোমের হাতটায় একটু হাত ঠেকে গেল তার। বিদ্যুৎ পরিবহন এখনও হয়! শারীরিক চাহিদা তো শ্রাবন্তী মেটাচ্ছে। মোম কি এখনও তার কাছে সেই আবেদন নিয়ে আসে? নাকি এককালে মোমের সম্পর্কে ভালোবাসার থেকে শরীরটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল?

মোম হাতের ব্যাগটা সোফায় ফেলে বলল, “তুই বস, আমি চা বসিয়ে আসি।”

রূপম আপত্তি জানাল, “নাহ, চা খাব না।”

মোম হাসল, “আরে আমি তো খাব। এই এলাম স্কুল থেকে।”

রূপম হাল ছাড়ল, “ঠিক আছে। দে।”

মোম রান্নাঘরে গেল। রূপম ঘরের চারদিকটা দেখল। সেই একইরকম আছে। যখন সে পড়তে আসত এই বাড়িতে। সাজানো গোছানো। মোমের মা খুব ভালো চাউমিন বানাতেন। সে এলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। একদিন স্যার চলে যাবার পর কেউ যখন ছিল না মোমকে প্রথম চুমুও এই ঘরেই। জীবনের প্রথম চুমু। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রথম সবকিছুর মতোই প্রথম চুমু সবসময়েই স্পেশাল। রূপম ধীরে ধীরে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল। মোম রান্না করছে। একটা অস্বস্তি হল হঠাৎ। এটা কি ঠিক হচ্ছে? শ্রাবন্তী যাই হোক, তার তো বিয়ে করা বউ। একটা অপরাধবোধ গ্রাস করে ফেলল তাকে। সেটা থেকেই হঠাৎ করে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল সে, "এই মোম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে। আমি আসছি।"

মোম তার দিকে ফিরল, কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দিল না, শুধু বলল, "আচ্ছা, তাহলে চা খাবি না?"

রূপম বলল, "না রে, সরি।"

আর পিছু ফিরল না সে। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোর পায়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

***

বাড়ি ফিরে ড্রয়িংরুমে বসতেই শ্রাবন্তীর তলব, "একটু শোনো।"

রূপম কিছু বলল না। চুপচাপ নিজের বেডরুমে প্রবেশ করল, "বলো।"

শ্রাবন্তী দরজাটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে বন্ধ করল। বাড়িতে অন্যরাও আছে, রূপমের দেখে একটু অস্বস্তি হল, কিন্তু কিছুই বলল না। এগুলিকেই তো অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে। কিংবা বিয়ের পরের পরিবর্তন।

শ্রাবন্তী জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিসফিস করে বলল, “তোমার বোনের বেডরুমে ছেলে ঢুকে যাচ্ছে তুমি জানো?”

১৩ মিলির কথা

বাড়িতে বিচারসভা বসেছে। আমার বেশ মজা হচ্ছে। টিভির ঘরে বাবা দাদা বউদি মা আমি আর দিদি। সভায় মূল অভিযোগকারী বউদি। যা বোঝা গেছে, দাদাকে বউদি জ্বালিয়ে খাচ্ছিল অয়নদার ব্যাপারটা নিয়ে, তাই রাতে খাবার পরে দাদা বাবাকে বলেছিল, বউদি নাকি আমাদের কিছু বলতে চায়। বাবা ঘাবড়ে-টাবড়ে গেছিল। আমি তখন ওখানেই ছিলাম বলে জানতে পেরেছিলাম। বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার বল তো?"

দাদা বিরক্ত আর অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, "দ্যাখো মাথায় কী চেপেছে কে জানে! যাই হোক, সবাইকে কী বলবে বলুক। বেশি কিছু বোলো না, যা বলবে শুনে যেয়ো। ও তো আর বেশিদিন থাকবে না, সুতরাং যা বলবে প্রতিবাদ কোরো না।"

বাবা দাদার কথা শুনে বলল, "আচ্ছা। ঝামেলা না হলেই হল।"

বাবার এই এক স্বভাব। সারাক্ষণ সব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। ক-দিন আগে আমাদের পিছনের বাড়ির যতীন জেঠু দিব্যি ওদের বাড়ির পাঁচিল তোলার সময় আমাদের বাড়ির খানিকটা জমিও জড়িয়ে নিল। মা বলতে গিয়ে কথা শুনে এসে বাবাকে বলল, "দ্যাখো কী করবে।"

বাবা গম্ভীর এবং উদার গলায় বলে দিয়েছিল, "থাক না, ওইটুকু জমি নিয়ে ওরা যদি খুশি থাকতে চায় থাকুক না। ঝামেলা না হলেই হল।"

মা-ও দিব্যি গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেছিল।

আমি কিন্তু এরকম না। নিজের হকের কোনও কিছু আমি ছাড়ি না। নেহাত বাবা ওরকম করল বলে, আমি হলে যতীন জেঠুর প্যান্ট হলুদ করে ছেড়ে দিতাম। ক্লাসে একবার এরকম একটা ঝামেলা হয়েছিল। নন্দিতা আমার একটা পেন দিব্যি তিনদিন আগে নিয়ে আর ফেরত দেয় না। শেষে চাইতেই হল। চাইতেই দেখি আকাশ থেকে পড়ল। আমি দেখিয়ে দিলাম ওকে ওই পেনে আমার নাম খোদাই করা আছে। একটা সাইট থেকে স্পেশাল নাম লেখানোর সিস্টেম দেখে অয়নদা কতগুলি পেন বানিয়ে আমাদের দিয়েছিল। দিদি আমি আরও কয়েকজন বন্ধুকে। আমার নামের পেন ঝেড়ে দেবে! তাও অয়নদার দেওয়া!!! ভাবতেই একদম শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছিলাম।

যাই হোক এবার কাজের কথায় আসি। দিব্যি আমরা খেয়ে-টেয়ে নিয়ে টিভির ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। টিভিতে সিরিয়াল চলছিল। বউদি গম্ভীর গলায় বাবাকে বলল, "টিভিটা বন্ধ হলে একটু খুশি হতাম। নইলে আমাদের সবার মনোযোগ ওই টিভির দিকে চলে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে।"

বাবা তাড়াতাড়ি রিমোটটা নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। ঘরে থমথমে পরিবেশ। বউদি নাটকীয়ভাবে শুরু করল, "আপনারা জানেন দেশে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি কী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে?"

বউদির কথা শুনে বাবা খুকখুক করে কেশে নিল। দাদা মোবাইল ঘাঁটছিল। বউদি দাদার মোবাইলটা কব্জা করল, "আমি যখন কথা বলব আমার কথা শুনতে হবে।"

দাদা ব্যাজার মুখে বউদির দিকে তাকাল। আমি এটা দেখে দিদিকে একটা চিমটি কাটলাম। প্রত্যুত্তরে দিদিও একটা কাটল। দিদিরটায় জোর অনেক বেশি ছিল। আমার

বেশ লাগল। কিন্তু আমি আর রিপ্লাই দিলাম না। পরের জন্য তোলা থাকল। পরে সময় করে হিসেব মিটিয়ে নিলেই হল।

বউদির আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সির কথা শুনে বাবা কী বুঝল কে জানে, বলে বসল, "বউমা, তোমরা আধুনিক কালের মেয়ে। বাচ্চা নেবে না নেবে না সেটা তোমরাই ঠিক করো। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। ক-দিনই বা বাঁচব। তবে যাওয়ার আগে নাতি বা নাতনির মুখ দেখে যেতে পারলে খুশি হতাম, এই যা।"

বউদি অত্যন্ত বিরক্ত হল বাবার কথায়, "আহ, আমি আমার কথা বলিনি।"

বাবা হতভম্ব হয়ে বলল, "তাহলে কার কথা বলছ?"

মা কোনও কথা বলল না। চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

বউদি বলল "আমি রূপসী আর মিলির জন্য বলছি। একটা বাড়িতে মেয়েদের বেডরুমে একটা ছেলে দিব্যি ঢুকে পড়ছে, গল্প করছে, এটা কিন্তু আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি আনতে পারে।"

আমি খিলখিল করে হেসে দিলাম বউদির কথায়। বউদি রেগেমেগে বলল, "হাসির কী হল মিলি?"

আমি বললাম, "এমনি, একটা জোক মনে পড়ে গেল তাই।"

বউদি আরও রেগে গেল আমার কথায়। "এখানে কী মীরাক্কেল হচ্ছে না আমি কমেডি নাইটস উইথ কপিল করছি?"

দাদা বউদির কথা শুনে বলল, "আহ। তুমি যেটা বলার বলো। আমি যাই। আমার ঘুম পেয়েছে।"

বাবা বলল, "না না, বউমা বলো না। কোন ছেলের কথা বলছ?"

বউদি বিরক্ত গলায় বলল, "ওই যে সকালে যে ছেলেটা এসেছিল, কী নাম যেন রূপসী ওর?"

দিদি ভাবলেশহীন গলায় বলল, "অয়ন।"

বউদি নিজের হাতের তালুতে আর-একটা হাত দিয়ে একটা ঘুসি মারল, "ইয়েস, অয়ন।" এবার বাবা আর মা-র দিকে ফিরল, "ওই ছেলেটা যে ওদের বেডরুমে গিয়ে আড্ডা মারে আপনারা জানেন না?"

মা বলল, "হ্যাঁ, ও তো বন্ধু ওদের।"

বউদি রেগে গেল, "বন্ধু মানে? বন্ধু হলে বেডরুমে ঢুকে পড়বে? ইয়ার্কি নাকি এটা?"

বাবা অসহায়ের মতো বউদির দিকে চেয়ে বলল, "আচ্ছা বউমা, এরপরে অয়ন এলে বলব টিভির ঘরে গল্প করতে। ওদের বেডরুমে না।"

বউদি বাবার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "ডিসগাস্টিং।"

বলে গটগট করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। বাবা দাদার দিকে তাকাল, "কী রে, বউমা রেগে গেল কেন?"

দাদা হেসে বলল, "ভাগ্যিস রেগেছে। নইলে রাতবিরেতে লেকচার শুনতে হত। যাও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো। নইলে আবার এলে আবার উলটোপালটা বকে মাথা খারাপ করে দেবে।"

বাবা বোকা বোকা চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকল।

১৪

সন্ধেবেলা সাধারণত বিভাসবাবু বেরোন না কিন্তু আজ বেরোলেন। বাড়িতে বউমা যতদিন আছে, ঠিক করেছেন রোজই বেরোবেন। এই মেয়েটিকে একটু ভয় পাওয়া শুরু করেছেন তিনি। ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলি বড়ো করে দেখে সেটা নিয়ে ঝামেলা পাকানোতে এই মেয়ে কম যায় না। তিনি জানতেন রূপমের তার ক্লাসের একটি মেয়ের সাথে বোঝাপড়া আছে। এই নিয়ে একবার বাড়িতে ঝামেলাও করেছিলেন। ছেলে প্রেম করবে কলেজ লাইফে, রক্ষণশীলতার কারণে মেনে নিতে পারেননি। একদিন ভীষণ বকেছিলেন রূপমকে। তারপর রূপম কয়েকদিন গুম মেরে ছিল। চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেল। ভেবেছিলেন কলেজে পড়লে প্রেম করলে হয়তো ছেলেটার রেজাল্ট খারাপ হবে। বকেছিলেন এইজন্যেই যে যা হবে তা খানিকটা যেন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। পরে মেয়ের বাপের সঙ্গে কথা বলে বিয়ে দিয়ে দিলেই হল। মেয়েটা ভালোই। পরিবারও ভালো। মাঝে মাঝে খেজুরও করেছিলেন মেয়েটার বাবার সাথে। ওদের বাড়ি থেকেও ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ছেলে যে অতটা চাপ নিয়ে নেবে বোঝেননি।

বাপের বকা খেয়ে মেয়েটাকে একেবারে ভুলেই গেছিল। তারপর হঠাৎ ফেসবুকে শ্রাবন্তীর সাথে আলাপ। বাড়িতে ফোন করে বলল, “বিয়ে ঠিক করো।” সব কেমন তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আজকাল মনে হয় ছেলেটা রাগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। এই বাড়ির জন্য এত হাইফাই মেয়ে দরকার ছিল না। এইসব মেয়েরা কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকা মেয়ে। বাপ-মায়ের এক মেয়ে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে মানুষ। জীবনেও কারও সাথে কোনও কিছু শেয়ার করতে হয়নি, বুঝবেই না সবাইকে নিয়ে কীভাবে থাকতে

হয়। বাড়িতে এলেই কেমন একটা থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। তা ছাড়া মফস্সলে শহরের অনেক মেয়েরই মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়। শ্রাবন্তী তো তার ওপরে গুরগাঁওতে থাকে। আরও নাকউঁচু হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন। এতশত ভেবে একপ্রকার পালিয়েই বাজারের দিকে রওনা দিলেন তিনি।

নারানের মুদির দোকানে তাঁদের সমবয়সিদের একটা আড্ডা চলে। চায়ের জোগানও থাকে। বহুদিন সিগারেট ছেড়েছেন। ওখানে গেলে বাকিদের খেতে দেখলে উশখুশ হয় মনে। মাঝে মাঝে টেনেও নেন ধোঁয়া। আজকে গিয়ে বসতে জমজমাট আলোচনার মধ্যে পড়লেন। সামনে ভোট। রতন চাকলাদার ফিনান্স স্পেশালিস্ট। পিএফ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেন প্রতিদিনই। প্রায় লাখ দেড়েক টাকা চিটফান্ডে রেখেছিলেন। মায়ের ভোগে যাবার পর প্রায়ই সরকারের নীতি নিয়ে সমালোচনা করেন। লেগ পুলিংও কম হয় না। ঘোতু সরখেল তো বলেই দিলেন, "তা তুমিই বাপু সস্তায় কিস্তিমাত করতে গেছিলে কেন? রিটায়ার্ড স্কুলমাস্টার। কেউ টাকা রাখে ওখানে? লোভ তো তোমার কম না যা দেখছি।"

রতন রেগে কাঁই হয়ে যান ঘোতুর কথায়, "ফালতু কথা বলবে না একদম, সব কি নিজের ইচ্ছায় চলা হয়? এখানে কে আছে যে নিজের ইচ্ছায় চলে? ছেলের বন্ধু বাপ্পা এসে ধরল, নতুন কোম্পানি দারুণ রিটার্ন, গিন্নির কাছে কাঁচুমাচু মুখ, বেকার ছেলে, একরকম গিন্নির কথাতেই পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে রেখেছিলাম, সে আমি কী করে বুঝব সব টাকা নিয়ে কোম্পানিতে লাল আলো জ্বলে যাবে? শুরুতে তো কম টাকাই রেখেছিলাম। তারপরে যখন দেখলাম এমআইএসের টাকাটা ঠিকঠাক দিচ্ছে আর সুদ পোস্ট অফিসের থেকে ঢের বেশি, রাখলাম খানিক ওখানে। তাও কপাল ভালো দেড়

লাখের ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের এখানে অনেকের পুরো পিএফ-ই মায়ের ভোগে গেছে।”

পীযূষ ফুট কাটলেন, “কোম্পানি লাটে উঠল, কিন্তু একটা জিনিস দেখেছ, বাপ্পা কিন্তু ভালোই বাড়ি-টাড়ি করল। প্রথমে খুব কান্নাকাটি করল, বলেছিল সুইসাইড করবে, আমরাই তো ধরেবেঁধে আটকালাম। ক-দিন পরে দেখলাম ছেলে তিনতলা হাঁকিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারগুলি বেশ ফিশি যাই বলো।”

রতন বললেন, “ওরকম বোলো না। ছেলেটার ব্যবসাও আছে। ওখান থেকেই হয়তো।”

পীযূষ বললেন, “তা কী করে ব্যবসায় অত তাড়াতাড়ি আঙুল ফুলে কলাগাছ হল শুনি? কোন ব্যবসায় এত তাড়াতাড়ি রিটার্ন আসে? সেটা না, আসল কথাটা বলো।”

রতন অবাক হলেন, “কী আসল কথা?”

পীযূষ মিচকি হাসি দিয়ে বললেন, “শাসক দলের লোক, কিছু বললে পাছে রাতবিরেতে তোমার ধুতি ধরে টান মারে, হে হে, মানে ভয়েই স্রেফ চুপচাপ মেনে নিলে সবটা”...

রতন এবার রেগে গেলেন, “ফালতু কথা বোলো না। নকশাল আমল কাটিয়ে আসা পাবলিক বুঝলে হে? ভয় পেতে যাব কেন?”

পীযূষ বললেন, “সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। তোমার সেই চওড়া ছাতিতে এখন পেসমেকার। ছেলে বাইরে থাকে। বুড়ো বুড়ি একা থাকো মেয়ের বিয়ে দিয়ে। কিছু কি আর বুঝি না?”

লেগে গেল দুই বুড়োয়। বিভাসবাবু এদের দেখে হাসছিলেন, মনটা খানিকটা ভালো হল। একটু আগেও কেমন মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসতে হবে।

১৫

"আমরা ফিরছি কবে যেন?" ভারী গলায় রূপমকে প্রশ্ন করল শ্রাবন্তী। রূপম বুঝতে পারল ঝড় আসার চান্স আছে একটা। সে সাবধানে ডিফেন্স করল, "শনিবার। কেন বলো তো?"

শ্রাবন্তী বিরক্তি প্রকাশ করল, "এখনও চারদিন। উফ! কী এমন রাজকার্য এখানে আছে তোমার বলো তো?"

রূপম মোবাইলে মেইল চেক করছিল। অফিসের কলিগদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রচুর মেসেজ এসছে। নোটিফিকেশন ভরে গেছে। সেসবের দিকে মন দেওয়ায় শ্রাবন্তীর প্রশ্নটা ঠিকঠাক শুনতে পেল না, বলল, "কী? কিছু বললে?"

শ্রাবন্তী তার হাতের মোবাইলটা কেড়ে নিল, "আমার সাথে কথা বলার সময় মোবাইল ঘাঁটবে না বলেছি না? আগে আমাকে উত্তর দাও।"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে, বলো কী প্রশ্ন আছে।"

শ্রাবন্তী বলল, "আমরা দু-দিন আগে তো এখান থেকে যেতে পারি! বাবার জন্য মনখারাপ করছে আমার।"

রূপম জানত এই কথাটা শ্রাবন্তী যে-কোনও সময় বলবে, প্রশ্নের উত্তর তৈরি করাই ছিল তার, "দু-মাস আগেই তো গেছিলে। এবার একটা কাজ করো না, তুমি কাল বরং চলে যাও। আমি গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি।"

শ্রাবন্তী তার দিকে আগুনে দৃষ্টিতে তাকাল। রূপম অবাক হবার ভঙ্গি করল, "কোনও সমস্যা?"

শ্রাবন্তী বলল, "তোমার আমাদের বাড়ি যেতে কী সমস্যা সেটা আগে বলো!!!"

রূপম ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি তার আগে বলো আমাদের বাড়িতে থাকতেই বা তোমার কী সমস্যা?"

শ্রাবন্তী চিরুনিটা ছুঁড়ে মারল মেঝেয়, "যা ইচ্ছা করো, আমি জানি না কিছু।"

রূপম হাত বাড়াল, "মোবাইলটা।"

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে ছুঁড়ে দিল তার দিকে মোবাইল। বলল, "এই নাও। শুরু করো খুটখুট।"

রূপম কিচ্ছু বলল না উত্তরে। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে আবার বন্ধুদের মেসেজ দেখা শুরু করল। কেউ রাজনীতি সংক্রান্ত ছবি পাঠিয়েছে, কেউ পর্ন পাঠিয়েছে, মনে মনে হাসল রূপম। পর্নের চাহিদা মনে হয় তাদের চিতায় ওঠার আগে অবধি থাকবে। সবাই বিবাহিত এই গ্রুপে, কিন্তু ভালো পর্ন পেলেই কেউ না কেউ গ্রুপে দিয়ে দেবে।

রূপম যখন ঠান্ডা হয়ে যায় শ্রাবন্তী সেই সময়টা রূপমকে একটু ভয়ই করে। যদিও সেটা বাইরে দেখায় না। বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।"

রূপম মোবাইলের দিকে চোখ রেখেই বলল, "আবার?"

শ্রাবন্তী থমথমে গলায় বলল, "ডেট মিস হয়েছে।"

রূপম অবাক হল, "মানে? কীসের ডেট? কিছুই বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "তুমি কিছুই বুঝবে না! ডেট মানে পিরিয়ডের ডেট মিস হয়েছে। নট শিয়োর আই অ্যাম প্রেগনেন্ট অর নট।"

রূপম হাঁ করে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "তাহলে কীভাবে শিয়োর হবে?"

শ্রাবন্তী বলল, "ওইজন্যই তো বাড়ি যেতে চাইছি। ওখানে ডক্টর আন্টিকে একবার দেখাই।"

রূপমের মাথাটা ঘুরে গেল খানিকটা। প্রেগন্যান্ট মানে বাচ্চা হবে? মানে সে বাবা হবে? এই মুহূর্তে তার যা পরিস্থিতি তাতে এতে খুশি হবে না দুঃখ পাবে ঠিক বুঝতে পারছিল না সে।

কী করবে সিদ্ধান্ত নিতেও পারছিল না। বলল, "তাহলে কালকে কলকাতা চলো। তোমাকে দিয়ে আসি।"

শ্রাবন্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, "তুমি থাকো। আমি টেন্সড।"

রূপম বলল, "বেশ। থাকব। বাচ্চা হলে খারাপ না, তাই না?"

শ্রাবন্তী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ইটস টু আর্লি। আর-একটু সময় পেলে ভালো হত। কিছুই তো এনজয় করতে পারলাম না! ভালো করে হানিমুনে পর্যন্ত যাওয়া হল না।"

রূপম বলল, "ঠিক আছে, এখন নিশ্চয় হাতে সময় আছে। তুমি কালকে বাড়ি যাও। ডাক্তার আন্টির সাথে ব্যাপারটা ডিসকাস করো। যা যা টেস্ট লাগে সেগুলি করো। তারপর ডিসিশন নিয়ো।"

শ্রাবন্তী বলল, "আচ্ছা। কিন্তু ওই ছেলেটা যেন ওদের ঘরে না ঢোকে আমরা না থাকলে, এটা সবাইকে বলে দিয়ো।"

রূপম এবার বিরক্ত হল। মেয়েটার মনে হয় সিডি কাটা রোগ আছে। একবার সিডি কেটে গেলে একটা কথাই বারবার বলে যায়!!!

১৬

কচি মেয়ে হল না এবারে। নারানের তাই সাধ মিটল না। প্রায় সাত মাস হয়ে গেছিল কিছু হচ্ছিল না। শেষমেষ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। একটা মেয়ে ছিলই। রোজ অফিস থেকে ফিরে ইটভাঁটার ওখান দিয়ে শর্টকাট করত। একে নারান খারাপ সময়ের জন্য ছাড় দিয়ে রাখত। এবার আর কাউকে না পেয়ে একেই টার্গেট করেছিল।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একটা স্তূপের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। হাতে হাতুড়ি ছিল। মেয়েটা যখন যাচ্ছিল নারান প্রথমে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। তারপরে মেয়েটা চেঁচাতে যেতেই নারান আগে হাতুড়ি দিয়ে সবেগে মেয়েটার মুখে আঘাত করল। দরদর করে রক্ত গড়ানো শুরু করল মুখ দিয়ে। চ্যাঁচানোটাও স্তিমিত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

তারপরে নারান আর বেশি চাপ নিল না। বডিটা তুলে এক কোনায় নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্র করে যা করার করে নিল। মেয়েটা বাধা দিল না, বা বাধা দেবার মতো জায়গায় ছিল না। ব্যাগ-ট্যাগগুলি কোনওকালেই নারান হাত দেয় না, এবারেও দিল না। তাকে দেখে মেয়েটা চিনতে পেরেছিল। সে যখন মেয়েটার শরীরের ওপর উঠেছিল মেয়েটা অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। ব্যথাবেদনা ভুলে যাচ্ছিল সম্ভবত। এই সময়টাই নারানকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়। এক অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি লাভ করে সে প্রত্যেকবার। আতঙ্কের থেকেও অবিশ্বাস ভর করে আসে বেশি করে মেয়েগুলির। তাকে সবাই চেনে। বাজারে কিছু না কিছু প্রয়োজনে সবাই আসে তার দোকানে। মধ্যবয়স্ক পরিচিত মুখটা যখন এরকম পাশবিক কাজকর্ম করে তখন স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসটাই আতঙ্ককে ছাপিয়ে যায়। সবকিছু হয়ে যাবার পর মেয়েটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। নারান একগাদা নুড়িপাথর

মেয়েটার যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা আর-একবার আর্তনাদ করাতে হাতুড়ি দিয়ে ওর মুখে আবার আঘাত করল সে। তারপরে গোটা শরীরটাকেই আঘাত করে যেতে থাকল। শরীরটা অনেক আগেই নিথর হয়ে গেছিল, কিন্তু তাতে নারানের ভ্রূক্ষেপ হচ্ছিল না। হাতে নাকে মুখে রক্ত ছিটকে এসে লাগছিল তার। এক পাশবিক উল্লাসে শরীরটাকে থেঁতলে যেতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শান্ত হল সে।

ইটভাঁটার পাশেই একটা পুকুর। মফস্বলের এক কোনায় হওয়ায় একরকম পরিত্যক্তই থাকে। সেখানে স্নান সেরে নিয়ে নারান স্তূপের পাশে রাখা কিটব্যাগটা খুলে গামছা বের করল। ভালো করে গা-হাত-পা মুছে জামাকাপড় চেঞ্জ করে নিল। প্রথমে সে এই জামাকাপড় পরেই বেরিয়েছিল। এখানে এসে বারমুডা আর একটা টি-শার্ট পরে অপেক্ষা করছিল। বারমুডা আর টি-শার্টটা স্নান করার পরে ভেজা ছিল। দুটো থেকে ভালো করে জল নিংড়ে নিয়ে একটা বড়ো প্লাস্টিক বের করে কিটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। জামাকাপড় পরে বেরোতে যাবে এমন সময় একটা বড়ো সাপ হেলতে দুলতে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। নারান সাপে ভয় পায় না। অবশ্য এই সাপটা বিষধর নয়। সে সাপ চেনে ভালোমতন। তার আরও একটা গুণ আছে। সে অন্ধকারেও সমান ক্ষিপ্র। কিন্তু এই গুণগুলি তার বউও জানে না। কাউকে বলার প্রয়োজনীয়তা সে কোনওকালেই বোধ করেনি। সে জানে নিজের গোপন অস্ত্র যত গোপন থাকে ততই ভালো। ব্যাগ থেকে আয়নাটা বের করে নিজেকে ভালো করে একবার দেখে নিল সে। শেষবারের মতো লাশটাকে দেখে ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

বাড়িতে বলে এসেছিল কলকাতা যাবার আছে। সে আর বউ আলাদা শোয়। বউয়ের শুচিবাই আছে। তার ঘরে প্রবেশ করে না। সদর দরজা খোলাই থাকে তাদের বাড়ির।

বউ আর সে ছাড়া বাড়িতে কেউ থাকে না। এই সময়েই সে কলকাতা থেকে আসে বলে দরজা খোলা রেখেই দুপুরে ঘুমোয় বউ। নারান চিন্তা করে না। তাদের এলাকায় চুরি কম হয়। আর তাদের পাড়ায় তো একেবারেই হয় না।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিল সে। কিটব্যাগটা খাটের তলায় রাখল। আয়নার সামনে দাঁড়াল একবার। কানের নিচে সামান্য রক্ত লেগে আছে। একবার চট করে চিন্তা করে নিল রাস্তায় আসার সময় কার কার সাথে দেখা হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখল সেরকম কেউই না, বরং সন্ধে ঝুপ করে নামার ফলে যদি কেউ তাকে দেখেও থাকে রক্তটা লক্ষ করার কথা না।

আর-একবার স্নান করতে ঢুকল সে। অনেকদিন পর মনটা খুশি লাগছিল। মনের আনন্দে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিল বাথরুমে।

১৭

সকাল সাতটাতেই গাড়ি বলে রেখেছিল রূপম। প্রথমে ঠিক ছিল শ্রাবন্তী একাই চলে যাবে। পরে ঠিক করল দিয়ে আসবে ওকে। একা একা অজানা ড্রাইভারের হাতে পাঠানো ঠিক হবে না। এমনিতে ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই তার, কিন্তু গতকাল রাতেই রূপসীকে বলা ছিল, তারা না উঠলে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারতে। মিলি আর রূপসী ভোর হতেই প্রবল উৎসাহে দরজায় ধাক্কা মারা শুরু করে দিল।

শ্রাবন্তী ঘুমঘোরেই তাকে বলল, "ওদের বলো তো বিরক্ত না করতে, আর-একটু ঘুমিয়ে নি, ক-টা আর বাজে।"

রূপমের ঘুম ভেঙে গেছিল। সে উঠে দরজা খুলে দিল, মিলি সামনে ছিল, ঝাড়বে ভেবেও কিছু বলল না। মনে পড়ল তার কথাতেই তো ওরা এটা করছিল। মিলি বলল, "দাদা ছ-টা বাজে। বউদিকে তুলে দে।"

রূপম বেসিনের দিকে মুখ ধোবার জন্য যেতে যেতে বলল, "দাঁড়া তো। ঠিক তুলে দেব।" রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তে খানিকটা লজ্জিত হল সে। মা সকাল থেকে উঠেই রান্না শুরু করে দিয়েছে। তারা ব্রেকফাস্ট খেয়ে কলকাতা যাবে তারই তোড়জোড় চলছে। সে একটু রাগল, "মা তোমার সকালে ওঠার কী দরকার ছিল বলো তো? আমরা তো রাস্তাতেই খেয়ে নিতে পারতাম।"

মা হাসল, "রাস্তার খাবার খেয়ে আর পেটখারাপ করার দরকার নেই। ওখানে তো বাইরের খাবারই খাস। বাড়িতে যখন এসেছিস তখন বাড়ির খাবার খা। আর কষ্টর কী আছে? তোর বাবার যখন অফিস থাকত ক-টায় উঠতাম ভুলে গেলি?"

রূপম আর কিছু বলল না। মাকে বলে লাভ নেই। মা কিছুতেই বুঝবে না। যত কষ্টই হোক, ঠিক সকালে উঠে রান্না করতে বসবেই। সে দাঁত মেজে দাড়ি কাটতে শুরু করল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা আজকাল নতুন না, কিন্তু একমুখ দাড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা একটু কেমন যেন লাগে। মিলি পড়তে গেল, সকালে ওর নাকি পড়া আছে। শ্রাবন্তী উঠে বাইরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল।

রূপম বুঝতে পারছিল না আজকে কী করবে। শ্রাবন্তীকে দিয়ে আসাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পর্যায়ে চলে যাবে। একটা সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার আছে। শ্রাবন্তী অনেকদিন থেকেই বলছিল এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা ও কিছুতেই চায় না। অ্যাক্সিডেন্টালি সেটা হয়ে যাওয়ায় এখন একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে। রূপম দাড়ি কাটতে কাটতে আড়চোখে শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। সকালে এত কিছু মাথাতে রাখেনি ও। দিব্যি মা-র সাথে কথা বলা শুরু করেছে।

বেল বাজল। মা অবাক হয়ে বলল, "এত সকালে আবার কে এল? মিলির কি পড়া হল না নাকি? এই রূপসী।"

রূপসী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দরজা খুলতে ছুটল। কয়েক সেকেন্ড পরেই এসে বলল, "দাদা, তোকে বাপ্পাদা ডাকছে, দেখ তো কী ব্যাপার।"

রূপম অবাক হল, "এত সকালে বাপ্পা? ওকে আসতে বল না!"

রূপসী বলল, "না না, কেমন একটা লাগছে ওর মুখ দেখে। তুই দেখ শিগগির।"

রূপসীর কথা শুনে শ্রাবন্তী বলল, "বাপ্পা কে?"

মা বলল, "পাড়ার ছেলে। রূপমের বন্ধু।"

রূপমের প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল দাড়ি কাটা। সে মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরোল। বাপ্পার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে সবকিছু শুষে নিয়েছে। অবাক হয়ে সে বলল, "কী রে! এত সকালে? কিছু হয়েছে নাকি?"

বাপ্পা বলল, "বাইরে আয়।"

রূপম বাইরে বেরোল। বাপ্পা কাঁপছিল। রূপম বুঝতে পারল না কী এমন হয়েছে বাপ্পা এরকম করছে। সে আবারও জিজ্ঞেস করল, "আরে এত ভয় পেয়েছিস কেন? কেউ মার-টার দিয়েছে নাকি?"

বাপ্পা বলল, "মোমকে রেপ করে কে ফেলে দিয়ে গেছে ইটভাঁটার ওখানে। গোটা বডিতে অসংখ্য আঘাতের দাগ। লাশটা সকালে দেখেছে ওই পালপাড়ার কে একজন।"

রূপম বুঝতে পারল না কী বলবে। তার মনে হচ্ছিল পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। সে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল। বাপ্পাও বসল। বলল, "আমার কিছু মাথায় আসছে না রে কী করব। আমি একদম ব্ল্যাংক হয়ে গেছি।"

শ্রাবন্তী কৌতূহলবশত বাইরে চলে এসেছিল। তাদের দুজনকে রাস্তার ওপরে বসে থাকতে দেখে অবাক হল, বলল, "কী হল? ওখানে এরকম বসে আছ কেন?"

রূপম উত্তর দিল না। তার মাথা কাজ করছিল না। বাপ্পা উঠে দাঁড়াল। শ্রাবন্তীর কাছে গিয়ে বলল, "আমাদের এক ছোটোবেলার বন্ধু মারা গেছে বউদি। তাই আমরা একটু আপসেট হয়ে গেছি।"

শ্রাবন্তী তার দিকে এগিয়ে গেল, "এই ঘরে এসে বসো। চলো ঘরে চলো।"

রূপমের মাথা হঠাৎ ভীষণ গরম হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, "চোপ। একদম চোপ। যাও ঘরে যাও।"

রূপম এত জোরে চ্যাঁচাল শ্রাবন্তী কেঁপে উঠল। রাস্তার মাঝখানে লোকজনের সামনে রূপমের এই ব্যবহারে অপমানিত হয়ে সে রেগেমেগে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। রূপম সেদিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। রূপসী বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে দাদার চিৎকার শুনে। বউদিকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখে সে শ্রাবন্তীকে সামলাতে ছুটল। বাপ্পা কিছুটা ধাতস্থ হয়েছিল। বলল, "বউদিকে এভাবে বলাটা তোর ঠিক হল না রে।"

রূপম রাস্তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। মোম!!!

শেষে মোম!!!

১৮

সাফল্য পাওয়াটা জীবনে খুব কঠিন। এককালে পাস কোর্সে সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট হয়েও নারানকে শেষমেষ মুদিখানার দোকান দিতে হয়। আজকাল নিজেও ভুলে গেছে যে সেই সময়টা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চাকরি না পাওয়ার হতাশায় কেটে গেছে।

আর আজকাল তো হতাশা জিনিসটাই তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবথেকে আনন্দ হয় ঘটনাটা ঘটার পরের দিন। কোনও খেলা জেতার পরে সমর্থকরা যে আগ্রহ নিয়ে পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার অপেক্ষা করে, তারও সেরকম হয় ঘটনা ঘটার পরের দিন। যখন তারই দোকানে বসে বুড়োগুলো দেশের আইনশৃঙ্খলাকে গালিগালাজ শুরু করে। উত্তেজনা প্রথম দু-তিনদিন শিখরে থাকে বুড়োগুলোর। নারানের সেই দিনগুলি দারুণ কাটে। সে চুপচাপ ভালোমানুষের মতো মুখ করে বুড়োগুলোর বাতেলা শোনে। কেউ কেউ আবার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। কী করে কী করে ব্যাপারটা হয়েছিল। নারান বুঝতে পারে অবচেতনে এই লোকগুলিও আসলে তার মতোই ধর্ষক।

সকালেই এলাকা সরগরম হয়ে গেছিল। দোকানের ছেলেটা সকাল আটটায় দোকান খোলে। সে রোজ ন-টায় দোকানে পৌঁছোয়। খুব শরীর খারাপ না করলে এই সময়ের নড়চড় হয় না। “কাণ্ড” ঘটানোর পরের দিন উত্তেজনা একটু বেশি থাকে কোন লোক কী কী বলল সেটা শোনার জন্য। সেদিনগুলিও একদম ন-টাতেই পৌঁছোয় অন্যদিনের মতো। কোনও সময়ের আগুপিছু করে না। ধীরেসুস্থে দোকানে গিয়ে লক্ষ্মী আর গণেশকে পুজো চড়িয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে পড়ে নিজের জায়গায়। পুজোটা নারান

মন দিয়েই করে। মাঝে মাঝেই তীর্থ করে আসে। যেটুকু পাপ হয়, তা তো গঙ্গাস্নানেই ধুয়ে মুছে যায়। নিজের কাছে তাই তার কোনও পাপবোধ নেই।

বাজারে এইচআইভি কথাটা আজকাল খুব শোনা যায়। কন্ডোম ব্যবহারের কথা বারবার বলে। তার আবার কন্ডোমে একেবারেই আসক্তি নেই। তার মতে রসগোল্লা তো আর প্লাস্টিকে জড়িয়ে খাওয়া যায় না। এই জিনিসও তাই। সে কুমারী মেয়েদের টার্গেট করে যাতে এইচআইভির কোনওরকম রিস্ক না থাকে।

সকালে দোকানে পৌঁছে পুজো চড়াতেই ছেলেটার উত্তেজিত কণ্ঠে রিপোর্টটা পেয়ে গেল সে। কে বা কারা আবার রেপ করে ইটভাঁটার ওখানে একটা মেয়েকে খুন করে রেখে গেছে। এলাকায় আগামী কাল বন্ধ ডাকা হয়েছে বিরোধী পার্টির পক্ষ থেকে। মন্ত্রী, পুলিশমহলের মাথারা সবাই তাদের এলাকায় আসছে আজ। একজন অবিবাহিতা স্কুলশিক্ষিকাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা কেউ মেনে নিতে পারছে না। বিরোধী দল থানা ঘেরাও করে রেখেছে সকাল থেকেই। এলাকা একেবারে থমথমে। যে-কোনও সময় বড়ো ঝামেলা বেঁধে যেতে পারে।

নারান চুপচাপ বসে সব শুনে কয়েকবার সহানুভূতিসুলভ শব্দ করল। দোকানে খদ্দের আসা শুরু হয়ে গেছে। দোকানের সামনের বেঞ্চিতে কয়েকজন এসে বসে তুমুল তর্ক শুরু করেছে। নারান কান খাড়া করল । বিভিন্নরকম মন্তব্য ভেসে আসছে –

“এ তো আচ্ছা সমস্যা শুরু হয়েছে মশাই। রাস্তাঘাটে মেয়েদের বেরোনো চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।”

“সরকার কী করছে বলুন তো দাদা? চুরি পরে বসে আছে?”

“এটা বিরোধী দলের লোকও তো করতে পারে দাদা। ইচ্ছা করে এমন করা যাতে সবাই সরকারকে দোষ দিতে পারে।”

কয়েকজন আবার অতি উৎসাহে লাশ দেখতে যাবে বলল। নারান মুখ ব্যাঁকাল। যাক। সবাই দেখে আসুক। সে লাশ দেখতে যায় না। লাশ দেখতে গিয়ে যদি চোখে পড়ে কোনও ক্লু ফেলে এসেছে সেটা টেনশনকে বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ না বুঝলেও সে তো বুঝতে পারবে ক্লু ফেলে এসেছে। তারপর রাতের ঘুমের দফারফা হয়ে যাবে খামোখা। পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে অনেকে যেমন বাড়ি ফিরে আর উত্তর মেলাতে বসে না পাছে কোনও ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে সেটা টেনশন বাড়িয়ে দেয়, নারান একেবারে সেই গোত্রে পড়ে।

দোকানের ছেলেটা একটু পরে এসে খবর দিল, থানা ঘেরাওয়ে বিরাট লাঠিচার্জ হয়েছে। পুলিশকে ইট মারায় পুলিশও প্রবলভাবে পিটিয়ে দিয়েছে বিরোধী দলের লোকেদের। তিন-চারজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। ওসির মাথা ইট লেগে ফেটে গেছে। সব মিডিয়া এসে গেছে।

নারান নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াচ্ছিল মনে মনে। তার জন্য এত বড়ো ব্যাপার হয়ে গেছে, এটাই তো প্রমাণ করে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক। মোটেও ফেলনা নয়।

খানিকক্ষণ বাদে বিকেলের বুড়োদের দলের কয়েকজন এল। প্রত্যেকের মুখই থমথমে। এর আগের বেশিরভাগ কেসগুলোই একটু গরিব মানুষের বাড়ির কেস করে আসছিল নারান। এবার একেবারে স্কুলটিচার শিকার করেছে, স্বাভাবিকভাবেই লোকের ক্লাস-কনশাসনেস চাগাড় দিয়ে উঠেছে। এবার তাদের ঘরেও হাত পড়ে গেছে ধরে নিয়ে সবাইকেই বেশ মুষড়ে পড়া দেখাচ্ছিল।

মেয়েটার শরীরটার কথা আর-একবার মনে করে নিল নারান চোখ বন্ধ করে। শরীরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। প্রতিটা অজানা শরীর একটা নতুন না-পড়া বইয়ের মতো। প্রত্যেকটায় আলাদা আলাদা মজা। সবকিছু হয়ে যাবার পর ক্ষতবিক্ষত শরীরটার স্মৃতি তার ছুঁচিবাইগ্রস্ত বউয়ের শরীর থেকে দূরে থাকা অতৃপ্ত শরীরটাকে তৃপ্ত করে।

পরের টার্গেট ঠিক করার কাজে লেগে যেতে হবে। চোখটা লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল নারানের।

১৯

অফিসার-ইন-চার্জ মাইতিবাবুর মাথা সকাল থেকেই খারাপ হয়ে আছে। আজ যাবার কথা ছিল কলকাতায়, বড়ো শালির মেয়ের বিয়ে, তিনদিনের ছুটি নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে স্টেশন লিভ করতে যাবেন এমন সময় এসপি-র ফোন এসে গেল। ধরব না ধরব না করেও ফোনটা ধরতে হল। আর ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড বকাঝকার শব্দ, "কী হচ্ছে বলুন তো মাইতি? দিনের পর দিন আপনার এলাকায় রেপ, মার্ডার হচ্ছে আর আপনি কী করছেন?"

মাইতিবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন, "না মানে কই সে তো অনেকদিন হয়ে গেল..."

ওপাশ থেকে রাগে ফেটে পড়লেন বড়োসাহেব, "আপনি কিচ্ছু জানেন না। অথচ আমাকে মিনিস্টার সাহেব সকাল থেকে ফোনে মাথা খেয়ে নিচ্ছেন। একজন স্কুলমিস্ট্রেস কাল ওখানে রেপড হয়ে মার্ডার হয়েছেন। আপনি শোনেননি?"

মাইতিবাবুর অজান্তেই মাথায় হাত চলে গেল। বরবাদ হয়ে গেল বিয়েবাড়ি খাওয়া। এবার শোনেননি বললে তো আরও কেস, তাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন, "হ্যাঁ স্যার। আসলে আজকে স্টেশন লিভ করছি তো, তাই মণ্ডলকে চার্জ হ্যান্ডওভার করে যাচ্ছিলাম আর কি।"

ওপাশ থেকে ধমক ভেসে এল, "সব যাওয়া ক্যান্সেল করুন। মিনিস্টার আসবেন ওখানে। ফুল ফোর্স যেন থাকে। এক্ষুনি স্পটে যান। বিরোধী দল যদি থানা ঘেরাও করে

একদম বরদাস্ত করবেন না। কড়া নির্দেশ আছে। ভোটের সময় কেউ যেন আপার হ্যান্ড নিতে না পারে। মনে রাখবেন।"

ফোনটা কেটে দিলেন বড়োসাহেব। মাইতিবাবু গিন্নির দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। বললেন, "তোমরা যাও। দেখি যদি ম্যানেজ করে রাতে যেতে পারি।"

গিন্নি কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও। আমি কিনে নিচ্ছি সোনার কিছু একটা কলকাতা থেকে।"

মাইতিবাবু করুণ চোখে গিন্নির দিকে তাকিয়ে এটিএম কার্ডটা দিয়ে দিলেন। বললেন, "এটা রাখো।"

গিন্নি ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণ্ডলকে ফোন করলেন, "কী হল মণ্ডল! আবার মার্ডার? কোথায় যেতে হবে?"

মণ্ডল অবাক হল, "সে কী স্যার, আপনি কলকাতায় যাননি?"

মাইতি উদ্গত খিস্তিটাকে কোনওমতে সামলে বললেন, "আর যাওয়া। সকাল সকাল এসপি সাহেব ফোন করে বললেন মিনিস্টার আসবেন। আর শোনো, থানা ঘেরাও-টেরাও হলে পাতি লাঠিচার্জ করে উঠিয়ে দিতে বলেছে।"

মণ্ডল বলল, "অলরেডি ঘেরাও শুরু হয়ে গেছে স্যার। তবে শান্তিপূর্ণ। লাঠিচার্জ করলে বরং সমস্যা বেশি।"

মাইতি এবার রেগে গেলেন প্রচণ্ড, "আমি ওসব জানি না। উপরমহলের যখন অর্ডার আছে, তোমাকে কে চিন্তা করতে বলেছে হে ছোকরা? মেরে ফাটিয়ে দাও। আর বডি কোথায়?"

মণ্ডল বলল, “স্যার পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে।”

মাইতির রাগ কমছিল না, “তুমি একবার তো আমায় ইনফর্ম করতে পারতে! জানো কী অপদস্থটাই না আমায় হতে হল। একে বিয়েবাড়ি যাওয়া হল না। এ নিয়ে গিন্নির অশান্তি নিতে হবে, তারপরে তোমার ওই। যাই হোক, পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে বডি ছেড়ে দিয়ো। মেয়েটার বাড়ির লোকজন?”

মণ্ডল বলল, “স্যার যা শুনলাম মেয়েটার মা ওর দাদার কাছে থাকে। এখানে থাকে না। বাড়িতে মেয়েটা একাই থাকত।”

মাইতি অবাক হলেন, “একা থাকত? তা তারা খবর পেয়েছে? আসবে কবে? ততদিন কি মর্গে ফেলে রেখে দেব নাকি? এই কথাগুলি ঠিক করেছ কিছু?”

মণ্ডল আমতা আমতা করতে লাগলেন, “মানে স্যার, সকাল থেকে যা যাচ্ছে, তাতে এত কিছু তো ভাবিনি। আচ্ছা আপনি থানায় আসুন, এখানে বরং সব ঠিক করে নিচ্ছি।”

অফিস কোয়ার্টার থেকে থানা মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ। মাইতিবাবু ইউনিফর্ম পরে থানার দিকে এগোতেই দেখতে পেলেন জটলা। বেশ ভালো লোক জড়ো হয়ে গেছে। সব বিরোধী দল না, দেখে যা মনে হচ্ছে। সাধারণ পাবলিকও আছে। তিনি বিরোধী দলনেতাকে দেখে তাঁর দিকেই এগিয়ে গেলেন। পরিতোষ বসু। এলাকায় আগে এমএলএ ছিলেন, তাঁকে দেখে ভিড়ের বাকিরা জোরে জোরে স্লোগান দিতে থাকল। “অপদার্থ পুলিশ” ইত্যাদি কথা আজ আর তাঁর রক্ত গরম করে না। অনেক শুনেছেন মাইতিবাবু। আগে যখন এরা ক্ষমতায় থাকত তখন এখনকার শাসক দলের লোকেদের কাছেও শুনতেন কথাগুলি।

পরিতোষবাবুকে বললেন, "স্যার এলাকা খালি করে দিন। আমাদের কাছে লাঠিচার্জের অর্ডার আছে।"

পরিতোষবাবু পুরোনো ঘুঘু। তাঁর কথা শুনে বুঝে গেলেন অনেকদিন পরে হিরো হবার চান্স এসেছে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "সে আপনারা যা করার করতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

মাইতি আর কথা বাড়ালেন না। ফোর্স জড়ো করা শুরু করে দিলেন থানার সামনে। এমনি সময়ে একটা ইট এসে কনস্টেবল অমল নস্করের পায়ে এসে লাগল। কিছু করার থাকল না। সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, হয়েও গেল। সবকিছু যখন শেষ হল দেখা গেল মাইতিবাবুর কখন মাথা ফেটে গেছে।

হাসপাতালে ব্যান্ডেজ করার সময়েই খবর এল মিনিস্টার আসছেন। এসপি-ও। মাইতিবাবু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ভাবতে লাগলেন আজকে ঠিক কার মুখ দেখে উঠেছিলেন!

২০ মিলি

আমি মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। দিদি জানে ব্যাপারটা। মাকে বলতে বারণ করেছি। ভীষণ অস্বস্তি হয় স্বপ্নটা দেখলে। সেটা হল আমি রাস্তায় বেরিয়েছি। রাস্তায় লোকজন ভর্তি। আর একটা সময় দেখছি সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। এই সময় আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিম স্রোত বয়ে যায়। কারণ এই সময়টা আমি আবিষ্কার করি আমার পরনে একটা সুতোও নেই। বাজারের সবাই আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর একে একে সবাই আমার দিকে এগোচ্ছে। এই সময়টা আমি দৌড়োতে চেষ্টা করি কিন্তু দৌড়োতে পারি না। যেদিকেই যাওয়ার চেষ্টা করি, পা সরে না। এদিকে সবাই এগিয়ে আসে। এই সময় চেঁচাই আমি। চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। গলা শুকিয়ে আসে। দিদি প্রথম প্রথম ভয় পেত। আজকাল মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

যেদিন থেকে আমাদের এখানে এরকম রেপ শুরু হয়েছে, যেদিন প্রথম জানতে পেরেছিলাম, আমি তখন টিউশনে ছিলাম। সবাই দেখতে যাবে বলল, ওদের সাথে আমিও চলে গেলাম। আর ওটাই হয়েছিল আমার ভুল। পুলিশ তখন ল্যাংটো শরীরটার গায়ে বাড়ির লোককে কাপড় পরাতে বলছে। আমি তৎক্ষণাৎ ওটা দেখেই বমি করে দি। বাড়ি এসে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সারাক্ষণ মনে হত এই বোধহয় কেউ আমাকে রেপ করতে আসছে। দিদি ভীষণ বকেছিল ওখানে গেছিলাম বলে। আসলে অত ভেবে যাইনি আমি। তারপর ছ-সাত মাস অন্তর যতবার এই ঘটনাটা আমাদের এলাকাতে হয়েছে, তারপর আমি এই দুঃস্বপ্নটা দেখতে শুরু করি। আর-একটা স্বপ্ন দেখি, অঙ্ক

পরীক্ষায় বসেছি, আর কিচ্ছু পারছি না। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নটা এতটা ভয়ংকর না, যতটা এটা।

আজকে সকালটা যে এরকম দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে তা ভাবতে পারিনি। দাদার যাবার কথা ছিল কলকাতায়। আর আজকেই সেই ভয়ংকর খবরটা এল। আমি তো এত কিছু জানতামই না। পড়তে গেছি। সবে স্যার নোটস দেওয়া শুরু করেছেন আর তখনই স্যারের মোবাইলে আমার বাড়ি থেকে ফোন এল। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে বলছে। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। এরকম তো কোনওদিন হয়নি! কী এমন সিরিয়াস ব্যাপার ঘটল, সেটা জানতে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ি গিয়ে শুনতে পারলাম কী ঘটেছে।

শোনার পর থেকে আমি বাথরুমে কল চালিয়ে মাথা ধুয়ে যাচ্ছি শুধু। আমি তো জানি, মোমদি একটা সময় আমাদের কাছে কী ছিল! এমনকি এখনও। রাস্তায় দেখতে পেলে জোর করে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেত। কিছু না কিছু না খাইয়ে তো ছাড়তই না, তার ওপরে এটা সেটা কিছু না কিছু দিয়েই ছাড়ত। আজকে ব্যাগ, কালকে একটা বই তো পরশু একটা দারুণ একটা কস্টিউম জুয়েলারিই দিয়ে দিত। আমি যদি বলতাম তোমার সবই কি আমাকে দিয়ে দেবে? মোমদি হেসে বলত, “দেব, তাতে সমস্যা আছে কোনও?”

শুধু দাদার কথা উঠলে মোমদি একটু অন্যরকম হয়ে যেত। মনে হত কেউ জোর করে এক টান মেরে ওর মুখ থেকে হাসিটা সরিয়ে নিয়েছে। আমিও চেষ্টা করতাম যতটা সম্ভব দাদার কথা না তুলতে। তবু চলে আসতই। মোবাইলটা দাদা দেবার পরে যখন ওর বাড়ি গেছিলাম, আমার হাতে মোবাইল দেখে মোমদি বলেছিল, “নতুন মোবাইল?”

আমি ক্যালানের মতো বলে দিয়েছিলাম, “হ্যাঁ, দাদা দিয়েছে।”

কথাটা শুনে সাথে সাথে মোবাইলটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল মোমদি। দাদা আর মোমদির মধ্যে যখন কুছ কুছ হত তখন আমি নিচের ক্লাসে পড়ি। তবে মোমদি এলেই আমি মোমদিকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতাম। ভীষণ প্রিয় ছিল মোমদি আমার। আর মোমদি আমাকে নিজের ছোটো বোনের মতোই ভালোবাসত।

আমার দুঃস্বপ্নটা যে মোমদির ক্ষেত্রেই এভাবে সত্যি হয়ে যাবে আমি ভাবতে পারিনি। যতবার সেই আগে দেখা ধর্ষিতা মহিলার মুখে মোমদির মুখ বসাচ্ছি, আমার কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হচ্ছে। এটা যে আমাদের বাড়ির উপর কতটা প্রভাব ফেলবে তা খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পারছি। দাদা সেই যে বেরিয়েছে বাপ্পাদার সাথে এখনও ফেরেনি। গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে আমি আসার পর থেকে দেখছি বউদি দরজা বন্ধ করে বসে আছে। কী হয়েছে কিছুই বুঝলাম না। বাবা কথা বলতে পারছে না। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। শুধু মা এত কিছুর মধ্যেও রান্না করে যাচ্ছে। কোনওমতে সবকিছু স্বাভাবিক রাখার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরের কষ্ট কি আর এভাবে আটকানো যায়? মোমদি তো মারও ভীষণ প্রিয় ছিল। আমাদের বাড়ি এলেই শুধু চাউ খেতে চাইত মা-র কাছে। ওর মা-র থেকেও নাকি আমার মা বেশি ভালো চাউ বানায়। আর কী আশ্চর্য, আজকে সকালে আমি মা-র কাছে চাউ খেতেই চেয়েছিলাম! দিদি চুপচাপ রান্নাঘরেই বসে আছে। কোনও কাজ করছে না। আমিও কী করব বুঝতে না পেরে চুপচাপ নিজের ঘরে এসে বসলাম। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। মনে হচ্ছে কোনওদিন এই মাথা ধরা সারবে না আমার।

২১

বাড়ির মাথা হবার অনেক সমস্যা। বাড়ি সামলাতে হয়। বাইরের ঝড়ঝাপটা সামলে বাড়ি ঠিক রাখতে হয়। বিভাসবাবু জানেন তাঁরই কাজ এত কিছুর পরে বাড়িটা ঠিকঠাক রাখা। কিন্তু আজ ভীষণ অসহায় বোধ করছিলেন। নিজের প্রতি একটা অদ্ভুত ঘেন্না আসছিল তাঁর। পুরো ব্যাপারটার জন্য অবচেতনে নিজেকেই দায়ী করে যাচ্ছিলেন তিনি। ব্যাপারটা যখন শুনলেন টিভির ঘরের সোফায় চুপ করে বসে পড়েছিলেন তিনি। প্রথম যে কথাটা তাঁর মাথার মধ্যে এসেছিল সেটা হল রূপমের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো মোমের এই পরিণতিটা হত না। এত কিছুর পরেও মেয়েটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আর-কোনও সম্পর্কে জড়াতে পারল না। এই কি নিয়তি ছিল?

বয়স হলে অনেক সমস্যা বাড়তে থাকে। সুগার প্রেশার স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে বিভাসবাবুর। মাঝে মাঝে বেশি হাঁটলে হাঁফও ধরে আজকাল। বার্ধক্য থাবা বসাচ্ছে জীবনীশক্তিতে। খবরটা শোনার পরে মাঝে মাঝে মাথাটা ব্ল্যাংক হয়ে যাচ্ছে তাঁর। কাউকে বলছেন না। বাড়িতে বজ্রপাত হয়েছে স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। ছেলে বেরিয়ে গেছে, বউমা দরজা বন্ধ করেছে। নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করছে। আজকের পরে ওদের সম্পর্কটাও বোধহয় স্বাভাবিক থাকবে না।

কলিংবেল বাজতে বিভাসবাবু বাইরে গিয়ে দেখলেন বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পাড়ারই পল্লবের গাড়ি। মনে পড়ল রূপমদের আজ কলকাতা যাবার কথা ছিল। ছেলেটিকে বসিয়ে বিভাসবাবু রান্নাঘরের দিকে এগোলেন। গিন্নি মনের সমস্ত শক্তি

রান্নায় লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি গিন্নিকেই বললেন, "পল্লব গাড়ি পাঠিয়েছে তো। কী করবে?"

গিন্নি মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর চোখেও সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট। বললেন, "বউমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে?" তারপরই গলা খাটো করে বললেন, "না না, এক কাজ করো, রূপসীকে বলো রূপমকে ফোন করতে। কী বলে দ্যাখো। নইলে কিছু টাকা দিয়ে গাড়িটাকে না করে দিতে হবে তো। এভাবে সারাদিন আটকে রাখা যাবে না তো!"

রূপসী নিজেদের ঘরে ছিল। বিভাসবাবু ডাকলেন ওকে। গাড়ির কথা বললেন। রূপসী বেশ কিছুক্ষণ ফোনে ট্রাই করে হাল ছেড়ে দিল, বলল, "দাদা তো ফোনই তুলছে না বাবা।"

বিভাসবাবু অসহায় বোধ করছিলেন। চুপচাপ সামনের ঘরে গিয়ে বসলেন। ছেলেটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বিভাসবাবু বললেন, "তুমি চলে যাও এখন। ওরা যাবে না আজকে। বিকেলের দিকে এসো। কিছু টাকা দিয়ে দেব।"

ছেলেটার মুখ দেখে বোঝা গেল রাগ হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক মানুষ দেখে মুখে কিছু বলল না। চুপচাপ গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। বিভাসবাবুর মনে হচ্ছিল বউমার সাথে কথা বলা দরকার। মেয়েটা একা আছে। অভিমান করেছে। পাড়ার লোকের সামনে রূপমের অপমান- ব্যাপারটা ভাবলেই অস্বস্তি হচ্ছিল বিভাসবাবুর। বাড়ির বউ, তার সঙ্গে এই ব্যবহারটা মেনে নেওয়া যায় না। আবার রূপমের দিকটাও দেখতে হবে। প্রথম প্রেম, ভোলা কোনওদিনই অত সহজ হয় না। এই খবরটা তো ওর কাছে একটা মারাত্মক শক তৈরি করবে।

রূপমের জন্য হঠাৎ করেই টেনশন শুরু হল বিভাসবাবুর। ছেলেটা যে মানসিক শক পেল, মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো? কোথায় গেল ঝোঁকের মাথায়? উদ্বেগটা মাথা চাড়া দিতে লাগল। ছেলেটা ফোন তুলছে না। একবার যাবেন ঘটনাস্থলে? পরক্ষণেই প্ল্যানটা ক্যান্সেল করলেন। সামনাসামনি দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব না।

বেশ খানিকক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন। শেষমেষ টিভি চালালেন। খবরের চ্যানেলে তাদের এলাকার কোনও খবরই নেই। মোম এখনও হেডলাইনে আসতে পারেনি। কলকাতা হলে যত তাড়াতাড়ি হেডলাইনে আসত, জেলার মফস্সল বলেই হয়তো সেই দামটা পাচ্ছে না খবরটা। মামুলি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা হলে দেবে, নইলে না দিলেও হয়। আর ধর্ষণটা এখন এমন জলভাত হয়ে গেছে দিনের পর দিন, যে এই খবরগুলি পাবলিক আজকাল আর খুব বেশি খায় না। খবরের মাঝে জাপানি তেল, বা রকেট ক্যাপসুলে মানুষের মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেওয়াটাও সংবাদমাধ্যম বেশ দায়িত্বের সাথেই পালন করে চলেছে। বিভাসবাবু মনে করতে পারলেন না, কবে থেকে খবরের নামে, ব্যবসার নামে এসব শুরু হয়েছে। অথচ একটা সময় ছিল, খবর পড়াটা যান্ত্রিক হলেও, তার একটা গাম্ভীর্য ছিল, একটা আভিজাত্য ছিল। এখন মনে হয় যাত্রাপালা চলছে। একই খবর সারাদিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখিয়ে যাবে, খবরের থেকে বিজ্ঞাপন চারগুণ দেখাবে, বিভাসবাবু খানিকক্ষণ দেখার পরে সহ্য করতে না পেরে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন।

মাথাটা ভার হয়ে এসেছে। প্রেশারের ওষুধ সকালে খেয়েছেন নাকি মনে করতে পারছিলেন না। আজকাল এই এক উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। প্রায়ই ভুলে যান কোন ওষুধ

খেয়েছেন আর কোন ওষুধ খাননি। মাঝে একবার দুবার প্রেশারের ওষুধ খেয়ে ফেলায় প্রেশার ফল করে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল।

কিন্তু আজ কি খেয়েছেন? মনে করতে পারছিলেন না তিনি। শেষমেশ কিছু না করে টিভির ঘরে বসেই রইলেন। একা একা।

২২

বাপ্পা কোনওকালেই প্রেম-ট্রেম দু-চোখে দেখতে পারে না। সে জানে জীবনে উন্নতির পথে আসল বাধা হল এই প্রেম। ছেলেপিলে স্কুল পালিয়ে, অফিস পালিয়ে প্রেম করবে আর তারপর সফল হলে ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করে আন্ডাবাচ্চা নিয়ে হোল লাইফ খিস্তাখিস্তি করে কাটিয়ে দিতে হবে, আর প্রেম ব্যর্থ হলে নেশা তো আছেই, জীবনেরও লাল লাইট জ্বলে যাবে। এই যে এত সফল ছেলে রূপম, দিব্যি লাল টুকটুকে কলকাতার বউ নিয়ে বাইরে গাড়ি ফ্ল্যাট নিয়ে আছিস, সেই তো পুরোনো ব্যথার যেই দেখলি এত বড়ো কেস হয়ে গেছে, রাস্তার উপর বউকেই ধমকিধামকি দিয়ে চলে এলি? এটা কি ঠিক হল? সে দু-চারবার রূপমকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ভাই তুই বাড়ি যা, লাশ-টাশ পোস্টমর্টেমে গেলে তারপরে তোকে ডাকছি, কিন্তু কে শুনবে কার কথা! ছেলেটা চিরকালই একটু ট্যারা। স্কুল লাইফে ভালো ছাত্র ছিল, কিন্তু কোথাও কোনও কিচাইন হলে সবার আগে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত। পাড়ার ঝামেলাতেও থাকত। পালিয়ে যেত না।

কিন্তু এখন ওকে কে বোঝাবে সময় অনেক পালটে গেছে। পলিটিক্স এখন খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কেউ জানে না। সকাল থেকে ইটভাঁটার জায়গাটায় তাকে নিয়ে এসে বসে আছে।

বডিতে কাপড় আলগাভাবে দেওয়া ছিল। চোখ মুখ থ্যাঁতলানো। চাপ চাপ রক্তে মাছি ঘুরঘুর করছে। বাপ্পা একবার দেখেই চোখ সরিয়ে নিল। যদিও যা লোকজন এসেছে,

সবাই সেটাই ড্যাবডেবিয়ে দেখছে। বাড়িতে সবারই মেয়ে বউ আছে, কিন্তু পরনারীর শরীর সব সময়েই আকর্ষণীয়, হোক না সে জীবিত কিংবা মৃত।

রূপম এসে পুলিশকেই ধমকি দিয়ে দিয়েছে বডি কেন কভার করা হয়নি বলে। থানার মেজোবাবু ছিল, একবার ওকে মেপে নিয়েছে। তারপর তাকে পাশে দেখে ডেকে নিয়েছে। সে-ই বোঝাল মেজোবাবুকে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার খবরটা পেয়ে, সেটা শুনে মেজোবাবু আর কিছু বললেন না। মেয়েটার মা দাদার কাছে থাকে। তার ফোন থেকেই ফোন করল। রূপমের প্রায়ই ফোন বেজে উঠছিল। ফোন ধরছিল না। চোখ-টোখ লাল হয়ে গেছে। বেশ খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমি কী করি এবার?"

বাপ্পা বুঝতে পারছিল সান্ত্বনা দেবার বিরক্তিকর কাজটা তাকেই করতে হবে। সে কোনওমতে কাঁধে-টাধে চাপড় মেরে শান্ত করার চেষ্টা করল রূপমকে। কিন্তু সে বুঝলে তো! এদিকে উপরতলার নেতারা তাকেই ফোন করতে শুরু করেছে। বাপ্পা ধরবে না ধরবে না করেও ধরল, এমএলএ। কলকাতার লোক, এখানে ভোটের পরে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কোনও দরকার হলে তাদের ফোন করেই এলাকা দেখাশোনার কাজ করে ফেলেন। এমএলএ-র নাম্বার দেখলে আগে বাপ্পা লাফালাফি জুড়ে দিত যে, যাক, আজকাল উপরমহলেও তার নাম পৌঁছোচ্ছে, কিন্তু এখন বিরক্ত হল, একে রূপমকে নিয়েই মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে, এরপর আবার কী ঝামেলা গায়ের ওপর আসে কে জানে!

ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে দাদার খোঁয়াড়ি ভাঙা গলা ভেসে এল, "কী হে বাপ্পা, ওখানে রেপ হয়েছে নাকি?"

বাপ্পা একটু সরে গেল রূপমের কাছ থেকে। রূপমের সামনে এখন এই নিয়ে কোনওরকম আলোচনাই করা যাবে না। এমনিতেই লোক গিজগিজ করছে জায়গাটাতে। বিরোধী দলের কিছু পাবলিকও সুযোগ বুঝে সেন্টু বেচা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিন হলে ছেলেপিলে এনে অ্যাকশান শুরু করে দিত, আজকে চুপচাপ থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছিল তার।

বাপ্পা প্রশ্নটার উত্তর দিল, "হ্যাঁ দাদা, কাল রাতে হয়েছে, ভোরে লাশ পাওয়া গেছে।"

"লাশ পাওয়া গেছে, তা রেপ হয়েছে কী করে জানলি? ক্যামেরা লাগানো ছিল নাকি?"

প্রশ্নটা শুনে দপ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল বাপ্পার। কিন্তু বুঝতে পারছিল এখন তাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বলল, "না মানে জামাকাপড় ছিল না তো গায়ে।"

একটা হিসহিস শব্দ ভেসে এল ওপাশ থেকে। তারপর শুনল, "ইশ রে, কচি একদম?"

বাপ্পার মনে হচ্ছিল ফোনের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে শুয়োরের বাচ্চাটার গলা টিপে দেয়, কিন্তু কিছু বলল না। কাটানোর চেষ্টা করল, "হ্যাঁ দাদা, আমার বন্ধুর বান্ধবী ছিল একসময়।"

"অ।" ও প্রান্ত একটু সতর্ক হল, "যাই হোক, অপোনেন্টের মাদারচোদগুলি বেশি লাফালাফি করলে গাঁড় ভেঙে দিবি। এখন ইলেকশনের সময়। মাথা যেন কেউ না তুলতে পারে। বুঝলি?"

বাপ্পা হ্যাঁ বলে ফোনটা রেখে গোঁজ হয়ে রইল। আজকে সে অ্যাকশান করতে পারবে না। অপোনেন্ট যা করার করুক। সব দিন অ্যাকশান করার দিন হয় না।

কিছু কিছু দিন কিছু না করেও কাটিয়ে দেওয়া উচিত। আজকে সেই দিন।

বিরোধী পার্টির চিত্ত ছেড়ে দেওয়ার ছেলে না। তাকে দেখতেই স্লোগান দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। বাপ্পা গুটিগুটি এগিয়ে গেল চিত্তর দিকে। তাকে এগোতে দেখে চিত্ত একটু হকচকিয়ে গেল। বাপ্পা বলল, "ভাই একটু এদিকে আয়।" চিত্ত সন্দিগ্ধ মনে চারদিক দেখে তার সাথে সাইডে চলল। বাপ্পা বলল, "ভাই, তোরা আজ যা পারিস কর, আমাকে ছেড়ে দে। আমার বন্ধুর কেস। এখানে প্লিজ কিছু করিস না।"

চিত্ত তার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড পজ নিয়ে বলল, "বন্ধু মানে?"

বাপ্পা রূপমকে ইশারায় দেখাল। চিত্ত বলল, "হাজব্যান্ড?"

বাপ্পা বলল, "আগে প্রেম করত। বাইরে থাকে। সকালে জানতে পারার পর থেকে পাগলের মতো করছে। এখানে সিন ক্রিয়েট হলে আরও সমস্যা হয়ে যাবে। তোরা দেখ অন্য কোথাও কিছু করলে কর, এখানে লাশটাকে নিয়ে কিছু করিস না আজ।"

চিত্ত একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আমি ম্যানেজ করছি। থানা ঘেরাও করতে বলি বরং।"

বাপ্পা কৃতজ্ঞ হল। মাঝে মাঝে কথা বললে রাজনীতিতে অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। এটা যে কেন অনেকে বুঝেও বোঝে না সে জানে না।

২৩

রূপম বাড়ি ফিরল রাত বারোটায়। ফোন ধরেনি একটাও। এলাকা গরম থেকে গরমতর হয়ে গেছে। র‍্যাফ নেমেছে বিকেলের দিকে। বিভাসবাবু কাউকে না পেয়ে শেষে বাপ্পাকে কোনওমতে ফোনে ধরতে পেরেছিলেন। বাপ্পা জানিয়েছিল, কলকাতা থেকে মোমের মা আর দাদা ফিরেছেন। রূপম কিছুতেই ফিরতে চাইছে না।

বিভাসবাবু আর কিছু শুনতে পাননি। টেনশনে বাড়ির সবাই টিভির ঘরে বসে ছিল সন্ধের পর থেকে। একমাত্র শ্রাবন্তী বাদ দিয়ে। শ্রাবন্তী দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। মিলি একবার দরজা ধাক্কিয়েছিল। শ্রাবন্তী ভিতর থেকে বলে দিয়েছিল এখন মাথা ধরেছে। কেউ যেন বিরক্ত না করে। সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নিও। বাড়িতেও কারও কিছু খাওয়া হয়নি। রান্না হয়ে খাবার টেবিলে সাজানো আছে সব। বিভাসবাবু সুগারের পেশেন্ট বলে খালি পেটে থাকতে পারবেন না ভেবে গিন্নি রুটি দিতে গেছিলেন সন্ধের দিকে, বিভাসবাবু প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। রূপম যখন ফিরল তখন টিভি চলছিল। টিভিতে মোমের ধর্ষণকে কেন্দ্র করে হওয়া ঝামেলাটাই দেখাচ্ছিল। কলিংবেল বাজলে বিভাসবাবু সতর্কতা নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন।

রূপমের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। একদিনে যেন অনেকটা বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে সে। মিলি আর রূপসী রূপম ফিরতেই তাকে ধরে সোফায় বসাল। বিভাসবাবুর অপরাধবোধটা ফিরে এল। রূপম প্রথম কথা বলল, "মা, খেতে দাও খিদে পেয়েছে।"

বিভাসবাবু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, “বউমাকে একটু ডেকে নে, মিলি আর রূপসী ডেকেছিল, সেই সকাল থেকে ঘর বন্ধ করে বসে আছে। কিছুই তো সেরকম মুখে দেয়নি।”

রূপম বিভাসবাবুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। কেউ কোনও কথা বলছিল না। এক অস্বস্তিকর নীরবতা ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করতে লাগল। একটা সময় রূপম উঠল, ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল।

মিলি ফিসফিস করে বলল, “বাবা দাদাকে জোর দাও, নইলে কিন্তু বউদিও খাবে না, দাদাও খাবে না। আরও সমস্যা হয়ে যাবে।”

বিভাসবাবু অসহায়ভাবে গিন্নির দিকে তাকালেন, বললেন, “তুমি একবার বলে দ্যাখো না।”

সবাই সবার দিকে তাকাল। কেউ কিছু বলল না। বিভাসবাবু বললেন, “চলো খেয়ে নি।”

টেবিলের দিকে তারা এগোতে তাদের সবাইকে অবাক করেই রূপম আর শ্রাবন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। রূপমের মা তাড়াহুড়ো করে খাবার টেবিলের দিকে ছুটলেন। মিলি রূপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল। রূপসী চোখ দিয়ে মিলিকে বকে দিল। মিলি হাসিটা সাথে সাথে গিলে ফেলল।

সবাই চুপচাপ খেয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলল না।

খেয়েদেয়ে ঘরে ঢুকতেই শ্রাবন্তী দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বলল, “মেয়েটা কে ছিল? এক্স?”

রূপম শান্ত স্বরে বলল, “স্নান করব। দরজা খোলো।”

শ্রাবন্তী দরজা খুলল না। বলল, “আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কে মেয়েটা? এক্স?”

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। শ্রাবন্তীকে আজকে অন্যরকম লাগছে? কেন জানে না, তার বারবার মনে হচ্ছিল শ্রাবন্তী ধীরে ধীরে মোমের মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে। মোমের শরীরটা তো সে কোনওদিন দেখেনি, আজকে দেখেছে, থ্যাঁতলানো শরীরটা অনেক জায়গাতেই অক্ষত ছিল। শ্রাবন্তীর শরীরের কথা তখন মনে আসেনি। তাহলে এখন মোমের শরীরটার কথা মনে আসছে কেন?

শ্রাবন্তী খাটে বসল। দৃঢ় গলায় বলল, "আমি কালকে বাড়ি যাব। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। না যেতে চাইলে যেয়ো না। আমি যেন যাই সে ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

রূপম কিছু বলল না। শ্রাবন্তীর অস্থির লাগছিল রূপমের এই নীরবতা। কেন জানে না, তাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মেয়ের সাথে শুয়ে এসেছে রূপম এটাই বারবার মনে হচ্ছিল শ্রাবন্তীর। আজকের আগে মেয়েটার নামই শোনেনি শ্রাবন্তী, অথচ আজকের দিনটা তাকে পুরো নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

রূপম বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বলল, "মোমের কথা তোমাকে আমি কোনওদিন বলিনি, এটা সত্যি। মোমকে আমি মুছে দিয়েছিলাম জীবন থেকে, তাই বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি। কিন্তু আজকে ওরা যখন মোমের নগ্ন শরীরটা সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল, আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। এখন আমি বুঝতে পারছি, মোমকে আসলে আমি মুছতে পারিনি। আমার মনে হল, কথাগুলি তোমাকে বলার আমি বললাম। তুমি কাল বাড়ি যেতে চাও আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব। এবার তুমি ঠিক করো কী করবে।"

শ্রাবন্তী বলল, "তাই করো। আমার একটু একা থাকা দরকার।"

রূপম বলল, "এখন থেকে? তাহলে আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।"

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "সিন ক্রিয়েট আর করার প্রয়োজন নেই। কাল আমাকে বাড়ি দিয়ে এসো তাহলেই হবে।"

রূপম আর কিছু বলল না।

২৪

বিছানায় কাছে থেকেও যখন মানসিক দূরত্ব অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন ব্যাপারটা মোটেও সুখকর হয় না। রূপমের সাথে শ্রাবন্তীর যে এর আগে একেবারে কোনওরকম ঝগড়া হয়নি তা না, কিন্তু সে সবসময়েই বিছানায় এসে সব ঠিক হয়ে যেত। একজন না একজন নরম থাকলে, অপরজন যত জেদই করুক, সম্পর্কে সমস্যা হয় না সচরাচর। কিন্তু এবার শ্রাবন্তীকে শক্ত হতে দেখে রূপম নরম হল না। সবসময়ে নত হওয়া সম্ভব নয়। আর আজ তো সে প্রশ্নই ওঠে না। যে মেয়ে আর-একটা মেয়ের ধর্ষিত আর খুন হবার থেকে নিজের ইগোকে আগে রাখতে পারে, তার সঙ্গে তাকে বাকি জীবনটা একই খাট, একই ঘর, একই বাড়ি, গাড়ি, পরিবার শেয়ার করতে হবে ভেবে, মাথায় আগুন জ্বলে যাচ্ছিল তার। অবশ্য সেনসিটিভ হওয়া আশা করাও যায় না ওর থেকে। ছোটো পরিবারের শহুরে মেয়ে, কোনও কিছু কারও সাথে কোনওদিন শেয়ার পর্যন্ত করেনি, ওর থেকে এত কিছু আশা করাটাও হাস্যকর।

রাত দেড়টায় একই খাটে দুজন দুদিকে শুলেও রূপম বুঝতে পারল শ্রাবন্তী এখনও ঘুমোয়নি। চুপচাপ শুয়ে আছে। তার রাগ হচ্ছিল। অদ্ভুত মেয়ে সত্যি। আজকের দিনটায় শ্রাবন্তী যে এরকম করতে পারে ভাবতে পারেনি সে। যতবার সবকিছু মাথা থেকে বের করে চোখ বুজতে যাচ্ছে মোমের শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই শরীরটাকে সে কোনওদিন চায়নি সে বলতে পারবে না। কিন্তু সেটা যে এইভাবে তার সামনে আসবে, তাও ঠিক আজকের দিনে, এই আশঙ্কাটা তার কোনওদিন ছিল না। গুরগাঁওতে থাকাকালীন এই ঘটনাটা ঘটলে সে কী করত? কাউকে না জানিয়ে লং ড্রাইভে গিয়ে

হয়তো কোনও ধাবায় সারাটা রাত মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত হাইওয়ের ধারে। কিন্তু আজকের এই অস্বস্তিকর রাতটা শেষ হবে বলে মনে হচ্ছিল না তার। এ যেন শাস্তির রাত।

মোবাইলটা বের করল সে। ঘুম যখন আসছেই না, মোবাইলটাই দেখা যাক। আনলক করার পর মিসড কল দেখে অবাক হল সে। সবটাই মিলি বা রূপসীর ফোন থেকে গেছে। শ্রাবন্তীর ফোন থেকে একটা ফোনও নেই। চমৎকৃত হল সে। বিয়ের পরপর যে শরীরটা তাকে সবচেয়ে বেশি টানত, সেই শরীরটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে, যেটা দেখে তার একফোঁটাও কাম জাগল না, পরিবর্তে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। মোমকে পোড়ানো দেখতে পারবে না সে। মেয়ের বন্ধু হিসেবে মোমের মায়ের পাশে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি। প্রবল অপরাধবোধ নেমে আসছিল সেই সময়টা। বাবা যেদিন ভীষণ বকেছিল মোমকে নিয়ে কথা শোনার পরে, সেসময়টা সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। খারাপ লেগেছিল। কিন্তু মোমের সঙ্গেও সেই সময়টা সে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। রাস্তায় একদিন মায়ের সাথে মোম যাচ্ছিল বাজারে, তাকে দেখে মোমের মা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন কেন সে হঠাৎ করে তাঁদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল, প্রত্যুত্তরে রূপম উলটোদিকে হাঁটা দিয়েছিল হনহন করে। মোম পরে একবার বলেছিল সেদিন মা ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর মোমের মা-র মুখোমুখি সে কোনওদিন হতে পারেনি। পারবেও না হয়তো আর-কোনওদিন।

মোমের সাথে কাটানো সময়গুলি সারাদিন ধরে ফ্ল্যাশব্যাক হয়েছে তার মাথায়। চোখ বন্ধ হলেও সেসবই ভেসে আসছে। আজ হঠাৎ করেই তার মনে হচ্ছিল আসলেই কি সে শ্রাবন্তীকে কোনওদিন ভালোবেসেছিল? নাকি পুরোটাই শারীরিক আকর্ষণ ছিল? মোম যে

এতদিন পরেও এতটা জুড়ে ছিল তাকে, সেটা আজকের দিনটা না গেলে সে জানতে পারত না হয়তো কোনওদিন। আর পাঁচটা লোকের মতোই সংসার করে জীবন চলে যেত।

একটা সময় বাড়ির ল্যান্ডফোন থেকে লুকিয়ে ফোন করত মোমকে। যেদিন পড়া থাকত না, সেদিন কখনও কখনও দিনে ওই এক-দেড় মিনিটের কথাই এক অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরিয়ে রাখত তাকে। মোম একবার বলেছিল বিয়ে হলে তারা ঘোর শ্রাবণে টিনের চালের তলায় বৃষ্টিতে ভিজবে। কথাটা মনে পড়তেই প্রবলভাবে সবকিছু নষ্ট করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। একটা মেয়ের স্বপ্ন, ইচ্ছা, সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছে সে। ধর্ষক তো শরীরটা নিয়েছে, মোমের মনের ধর্ষণ তো সে-ই করেছিল আসলে। শুধু তার জন্য একটা মেয়ে সারাজীবন বিয়ে করল না, এরকম পাগলের মতো রাস্তাঘাটে একা একা ঘুরে বেড়াত, বাইরেটা যতই ঠিক থাকুক, ভিতরটা তো সেই কবেই দুমড়ে মুচড়ে গেছিল শুধু তারই জন্য।

রূপম চেঁচাতে চাইছিল, পারল না। চুপচাপ দুজনে পাশাপাশি সারারাত জেগে থাকল। কেউ কারও সাথে একটা কথাও বলল না।

২৫ মিলি

আমি দেখলাম আমরা আসলে দুঃখকষ্টকে ভোলবার জন্য অনেক কিছু করতে পারি। আবার বাড়ি থমথমে হলেও যদি যার কারণে থমথমে সে না থাকে, বাড়ি তখন আবার চেষ্টা করে সবকিছু ভুলে নতুন করে বাঁচতে।

এই তো কাল এত কিছু হল, দাদা এত রাতে এল, চুপচাপ খেয়ে নিল, আমি আর দিদি রাত জেগে এত কাঁদলাম, এইসবই কিন্তু ম্যাজিকের মতো চেঞ্জ হয়ে গেল দাদা বউদিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই। দাদা প্রথমে যেতে চাইছিল না, সকালে উঠে চুপচাপ বসে ছিল খাবার টেবিলে। আমি দাঁত মাজছিলাম। দাঁত মাজতে আমি অনেক সময় নি। অন্য দিন দাদা দেখলেই ধমক দিত, “আরে গাধা এত সময় ধরে কেউ দাঁত মাজে নাকি?” কিন্তু আজ দেখলই না আমার দিকে। আমি খানিকটা দাদাকে খ্যাপাতেই দাঁত বেশিক্ষণ ধরে মাজতাম, আজ ওর মেজাজ খারাপ দেখে মাজলাম না। মা দাদাকে জিজ্ঞেস করল, “কী রে আজ কলকাতা যাবি?”

দাদা তখন বলল, “না, ওকেই পাঠিয়ে দেব গাড়ি করে।”

মা শুনেই চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বাড়ির বউ এতটা রাস্তা একটা অচেনা অজানা ড্রাইভারের সাথে যাবে এটা হয় নাকি তাও এইরকম একটা সময়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষমেশ দাদা দেখলাম তেতো মুখেই রাজি হয়ে গেল যেতে।

ব্রেকফাস্ট করে ওরা বেরিয়ে যেতেই সকালে অয়নদা এল। অয়নদার সাথে বাবা অনেকক্ষণ কলেজ নিয়ে কথা বলল। মা-ও এল। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা হতে দেখলাম

বাড়ির পরিবেশ বেশ হালকা হতে শুরু করেছে। আমি যথারীতি যথাসম্ভব ঝাড়ি-টাড়ি মেরে নিলাম অয়নদাকে, তারপরে পড়তে গেলাম।

অবশ্য পড়তে গিয়ে একটু হলেও অবাক হলাম। এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু কারও মুখ দেখে সেটা বুঝলাম না। সেই হাসিঠাট্টা যেমন চলে সেরকমই চলছে। স্যার যথারীতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি পড়ছ তো? নাকি সারাদিন মোবাইল ঘেঁটেই কেটে যায়?"

আমি স্যারের দিকে তাকাতে গিয়ে পার্থর দিকে তাকালাম। শয়তানটার নজর আবার দেখি মেয়েদের বুকের দিকে ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছা হচ্ছিল খাতাটা ছুঁড়ে মারি। কিন্তু কিছু করলাম না। স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম, "না স্যার, পড়া একদমই হচ্ছে না।"

স্যার ভেবেছিলেন আমি পড়ছি বললে চাটবেন। আমার না শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "যাহ্, কেন? মোবাইল ঘাঁটছ?"

এটার উত্তর স্যার ভেবেছিলেন না বলব। আমি আবার উলটোটা করলাম। বললাম, "হ্যাঁ স্যার। খুব।"

শুনে সবাই হেসে উঠল। স্যার ধমক দেবার চেষ্টা করলেন, "হাসবে না। এখানে ইয়ার্কি হচ্ছে না। আমি এখানে গোরু চড়াতে আসিনি।"

মধুমিতাটা এমন বিচ্ছু, স্যারের কথাটা শেষ হতেই নিরীহ মুখে বলে উঠল, "স্যার যারা গোরু চড়ায় তারা কি খুব হাসাহাসি করে বুঝি?"

স্যার রেগে ব্যোম হয়ে গেলেন। মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। খুব রেগে গিয়ে বললেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে? ইব্রাহিম লোদি আর বাবরের শাসনকালের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করো। এক্ষুনি বলো।"

স্যারের প্রশ্ন শুনেই সবাই খাতার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকাল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "স্যার ইব্রাহিম লোদি আর বাবর? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?"

আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল। স্যার এবার রেগেমেগে বললেন, "তোমরা খুব বাড় বেড়েছ। পরের দিন সবাই গার্জিয়ান নিয়ে আসবে। নইলে আমি পড়াবই না একদম।"

আমি ভাবলাম এই মরেছে। চুপচাপ খাতা টেনে বসলাম। স্যার আবার নোটস দিতে শুরু করলেন। কিন্তু একবার যদি ব্যাচে হাসাহাসি শুরু হয় সেটাকে থামানো খুব কঠিন। কোত্থেকে একটা বদখৎ গন্ধ আসল হঠাৎ করে। একটা ছেলে হঠাৎ রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। স্যার বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন গম্ভীর হয়ে থাকতে, তারপর নিজেও হেসে ফেললেন। আমার বেশ ভালো লাগছিল। একটা পরিবেশের পরিবর্তন যে মনকে কতটা পালটে দেয় সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। অবশ্য আমাদের এখানে সবকিছু আগের মতো নেই। রাস্তায় আসতে আসতে শুনলাম কাল আবার বন্ধ ডেকেছে। বেশ ঝামেলাও হয়েছে কালকে। থানার দিকে নাকি র‍্যাফ নেমেছে। কিছু একটা চলছে চারদিকে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

স্যার বেরোলে সবাই স্যারের সাথেই বেরিয়ে যায়। আজকে মধুমিতা আমাকে একটা চিমটি কেটে বলল, "থাকবি। একটু পরে যাবি।"

আমি অগত্যা বেরোলাম না। সবাই বেরোতে মধুমিতা বলল, "এই মিলি, মোমদির সাথে তোর দাদার প্রেম ছিল না?"

আমি মধুমিতার দিকে তাকালাম। মেয়েটা সরল কিন্তু লোকের কেচ্ছা ঘাঁটার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। অবশ্য সেটা আমিও করি না বলা ভুল। ওর কথা শুনে বললাম "হ্যাঁ। ছিল তো।"

মধুমিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "তোর দাদা কী বলল? কষ্ট পেয়েছে না?"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার কাজ আছে। পরে কথা বলব।" বলেই জুতো পরতে ছুটলাম। ওর সাথে বেশিক্ষণ থাকলে পেট থেকে সব টেনে টেনে বের করে ফেলবে। তারপর ক্লাসে যখন ওর সাথে ঝগড়া হবে, অন্য গ্রুপের মেয়েদের আমার ফ্যামিলির কেচ্ছা নুন লংকা দিয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে বলবে।

পাতি কেটে পড়লাম।

২৬

গাড়ি বড়ো রাস্তায় উঠলে রূপম চোখ বুজল। রাজ্যের ক্লান্তি এসে চোখে নেমেছে তার। কাল সারারাত ঘুমোয়নি। সারাদিন এত পরিশ্রম।

কলকাতা তাদের অঞ্চল থেকে দুশো কিলোমিটার দূরত্বে। রাস্তা পাকা হলেও মাঝে মাঝে খারাপ রাস্তাও পড়ছে। কয়েক ঘণ্টা পরে রূপমের ঘুম ভাঙল মোবাইলের শব্দে। তার ফোন বাজছে। নম্বরটা দেখে একটু চমকাল সে। মোমদের বাড়ির ল্যান্ডলাইন নাম্বার। এই নাম্বারটা তার মুখস্থ ছিল। এখনও ভোলেনি। মাঝে মাঝেই ইচ্ছা হলে এই নাম্বারে ফোন করে মোম হ্যালো বললেই ফোন কেটে দিত সে।

ফোনটা ধরল সে। ওপাশ থেকে মোমের দাদার গলা ভেসে এল, "রূপম?"

-হ্যাঁ বলছি।

-তুই কি আছিস এখন?

-না, আমি কলকাতা যাচ্ছি একটু। ওকে দিয়ে আসতে।

-ওহ। না রে, তাহলে তুই কি ফিরবি আর, না ওখান থেকেই চলে যাবি?

রূপম বুঝল না কী ব্যাপার। জিজ্ঞেস করল, "কেন বলো তো?"

-আসলে বুঝতেই পারছিস, কাল থেকে মা কিছুই খায়নি প্রায়। কতবার যে বোঝানো হচ্ছে। কাঁদছে আর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে শুধু। তুই যদি একবার এসে কথা বলতি...

রূপম আড়চোখে একবার শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। ঘুমোচ্ছে, কিন্তু চোখ বুজে থেকে তার দিকে কান দিয়ে সব শুনছে নাকি সেটা বুঝতে পারল না সে, সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, দেখি

আমার ফেরার কথা আছে, আজ রাতেই কলকাতা থেকে ফিরে আসব। কাল সকালে নাহয়...”

-আচ্ছা তাহলেই হবে। ঠিক আছে এখন রাখছি রে।

ফোনটা কেটে গেল। রূপম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। শুধু ইট কাঠ বালি পাথর চলে আসছে লরিতে করে। কেউ বাড়ি করছে, কেউ দোকান করছে, সবকিছুই কংক্রিটের করে নিতে হবে। আগে তাদের মফস্সলে মাটির বাড়ি ছিল, এখন একদম গ্রামের দিক ছাড়া সেসব দেখাই যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। এত ধর্ষণ, এত নির্যাতন তাদের ছোটোবেলায় তো এই বিপুল পরিমাণে ছিল না! তাহলে সবই কি নগরায়ণের সাইড এফেক্ট! ছোটো ছোটো ছেলেদের হাতে হাতে মোবাইল, তাতে অবাধ পর্ন, এই সমস্তই কি আসলে অনিবার্য ধর্ষণের দিকে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে না?

কিন্তু খটকা তার অন্য জায়গায় লাগছে। মোমকে যেভাবে খুন করেছে সেটা নিয়ে। কারও ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলে লোকে এরকমভাবে খুন করে। অথচ সে ঘটনাস্থলেই শুনল যে লোকটা এসব করছে, আসলে প্রায় সব খুনই এই একই ভাবে করে গেছে। প্রচণ্ড বেশি জোরে শরীরে আঘাত দিয়েছে। এত রাগ কেন হবে মেয়েদের প্রতি তার? কারণটা কী হতে পারে? আচমকাই হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তার। হাতের কাছে যদি কোনওদিন সে পায় এই খুনিকে, এক মুহূর্তের জন্যও বাঁচিয়ে রাখবে না সে।

গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে বিকট শব্দ করে পাংচার হয়ে গেল। শ্রাবন্তী ঘুম থেকে উঠল। বলল, “কী হল?”

রূপম বলল, “পাংচার।”

শ্রাবন্তী চোখ বন্ধ করল আবার। বলল, "তুমি আজকে কলকাতায় থাকবে না?"

রূপম বুঝল ফোনের কথোপকথন সবই শুনেছে শ্রাবন্তী। সে বলল, "নাহ। গাড়িটা ফিরবে তো। ওর সাথেই ফিরে আসব। নইলে খামোখা একদিন দু-দিন পরে যবেই আসি আবার বাড়তি খরচ।"

শ্রাবন্তী বলল "আর যদি প্রেগন্যান্ট হই?"

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে স্টেপনি বের করছে। তাদের কথা ওর শোনার কথা না। তবুও রূপম চোখ দিয়ে ড্রাইভারকে দেখাল।

শ্রাবন্তী বলল, "শুনতে পাবে না।"

রূপম বলল, "সেটা আমি কীভাবে বলব। সেটা তো তোমার ডিসিশন। আমার কথা তুমি শুনবে?"

শ্রাবন্তী বাইরের দিকে তাকাল। বলল, "কেন শুনব না। তোমার বাচ্চা যখন তোমার কথা না শোনার তো কিছু নেই।"

রূপম শ্রাবন্তীর চোখে চোখ রাখল, "আমি হলে তো বলব বাচ্চাটা নিতে। তুমি সেটা নেবে?"

শ্রাবন্তী তক্ষুনি কোনও উত্তর দিল না। একটু ভেবে বলল, "ভেবে দেখব। বাড়ি যাই। তারপর ডিসিশন নি।"

রূপম আর-কোনও কথা বলল না। শ্রাবন্তী এরকমই। প্রথমে বলবে রূপমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারপর সেই নিজে যেটা বুঝবে সেটাই করবে।

চাকা লাগাতে বেশিক্ষণ লাগল না। গাড়ি রওনা দিল আবার। রূপম চোখ বুজতে গিয়েও খুলতে বাধ্য হল। আবার মোমের শরীরটা ভেসে আসছে চোখের সামনে।

২৭

একটা কচি মেয়ে আর একটা বয়স্ক মেয়ের গায়ে আসলে একই গন্ধ থাকে না। কচি অবস্থায় মেয়েটা যেরকম তাজা থাকে, বয়স বাড়তে বাড়তে মেয়েটার শরীরে অনেকরকম সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। পঁচিশের উপরে মেয়েদের মেরে খুব একটা মজা পাওয়া যায় না। বাচ্চা মেয়েগুলি হাত-পা ছোড়ে বেশি, তাই ওদের মেরে মজা বেশি। এই মেয়েটাকে মেরে খুব একটা মজা পাওয়া যায়নি। মেয়েটা যেন মরেই ছিল। নারানের বিরক্ত লাগছিল। এই ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। অথচ খুন করেও সেই মজাটা পাওয়া গেল না, এই ফাঁকে তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে! ছ-মাস চুপ করে বসে থাকলে তবে চারদিকের নজর কমবে। তখন ধীরেসুস্থে আবার শিকারে নামতে পারা যাবে।

দোকানেই বসে ছিল সে, এমন সময় কচি মেয়েটাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখল নারান। দোকান ভর্তি লোক, ফাঁকা থাকলে একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিত। বাঘের শিকারের নিয়ম শুনেছিল সে একবার, সত্যি মিথ্যা যাচাই করে দেখা তার পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। মিত্রবাবু বলেছিলেন একবার, বাঘ নাকি যখন শিকার করে তখন নাকি একবার শুধু টার্গেট ফিক্স করে নেয়। তারপরে আর কোনও দিকে তাকায় না। শিকারের পিছু পিছু যায়। নজর রাখে, তারপর সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপরে। এই ব্যাপারটা তার বেশ মনে ধরেছিল। তারপর থেকে সে এই নীতিটাই ফলো করে।

মেয়েটাকে দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখে নারান তাড়াহুড়ো করল না। শান্তভাবে ছেলেটাকে বলল, "একটু দোকানে থাক। আমি বাড়ি থেকে আসছি। একটা ওষুধ খেতে ভুলে গেছি।"

ছেলেটা চাপ নিল না। দোকানে আড্ডা মারা লোকেরাও সেটা দেখলই না। নারান চুপচাপ বেরোল। মেয়েটার সাথে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণ মানুষের মতই হাঁটতে লাগল। ভিড়ে সে যখন হাঁটে তখন কেউ বুঝতে পারে না। নারান ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগল। বাজারে এখনও সব দোকান খোলেনি। বন্ধের একটা রেশ চলছে। অনেক দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। মেয়েটার দিকে নারান একবারও সরাসরি তাকাচ্ছিল না। মেয়েটাকে দেখার এখন তার কোনও দরকার নেই। মেয়েটার রুটটা তার জানা দরকার। ইটভাঁটা অঞ্চলটা ছাড়াও এলাকায় আরও নির্জন এলাকা আছে যেখানে সচরাচর খুব বেশি লোক থাকে না।

নারানের হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল। প্রতিবারই এই সময়টা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে যায় তার পক্ষে। জোরে জোরে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিলে তারপরে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আসে। সে জানে, এই সময় কিছুতেই ভুল করতে নেই।

মেয়েটা অশ্বত্থতলার দিক দিয়ে ডানদিকে ঘুরল। নারান খুশি হল। যে রাস্তা দিয়ে মেয়েটা তার মানে বাড়ি ফেরে সেই রাস্তার মাঝখানে ভাঙা মন্দিরটা পড়ে। মন্দিরের পিছনে সুন্দর জায়গা আছে ঘাপটি মেরে থাকার। নারান এবার মেয়েটার দিকে তাকাল। রাস্তায় এখন ভালো লোকজন আছে। পরিচিত লোকেদের সাথেও তার দেখা হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। হাসিমুখে তাদের পার করে যাচ্ছিল সে। মেয়েটা মাঝে মাঝে

মোবাইল বের করছে। খুটখুট করতে করতে হাঁটছে। এটাও একটা পজিটিভ ব্যাপার তার কাছে। এর মানে হল চলাফেরার সময় মেয়েটা একেবারেই সতর্ক থাকে না।

ফলো করার সময় মনে মনে প্ল্যানটা ভাজাও হয়ে যায় তার। পেছন থেকে গিয়ে মুখটা গামছায় জড়িয়ে কোনওভাবে ভাঙা প্রাচীরটার পিছনে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। নারান উত্তেজিত হতে লাগল। শুধু জানতে হবে বিকেল বা সন্ধের দিকে মেয়েটা এই রাস্তা দিয়ে কবে যায় বা আদৌ যায় কি না। মেয়েটার বাড়ি এসে পড়েছিল। চারদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে যেতে লাগল সে নির্বিকার মুখ করে।

কিন্তু এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই অঞ্চলে কোত্থেকে একটা পাগলের আবির্ভাব হয়েছে সে শুনেছিল বটে কিন্তু কোনওদিন চোখে দেখেনি। চুপচাপ হেঁটে জায়গাটা পার হবার সময়েই তার সামনে লাফ দিয়ে পাগলটা পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অকথ্য গালিগালাজ শুরু করল। নারান পাগলটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা যতই করে ততই পাগলটা তাকে ঘিরে ধরে গালিগালাজ করে যায়। বেগতিক দেখে নারান দৌড় মেরে ওই মেয়েটার বাড়িতেই ঢুকে পড়ল।

২৮

কোনও-কোনওদিন না বলে বৃষ্টি আসে। সকাল থেকে গরমে মাথা খারাপ করে দেবে। আর বিকেল নাগাদ এমন বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, যে আগে থেকে কিছু প্ল্যান হয়ে থাকলে সেসব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। কিন্তু সেসব ভেস্তে গেলেও খুব একটা খারাপ লাগে না। বরং বৃষ্টিটাই তখন ভালো লেগে যায়।

শ্রাবন্তীদের বাড়িতে আসার আগে অবধি রূপমের প্ল্যান ছিল শ্রাবন্তীকে নামিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যাবে। তিনটে নাগাদ পৌঁছে লাঞ্চ করে বেরোনো ঠিক ছিল তার। কিন্তু সেসবের কিছুই হল না। বিকেল চারটে নাগাদ বেরোতে যাবে আর সেসময় কালবৈশাখী শুরু হয়ে গেল। শ্রাবন্তীর মা-ই বললেন থেকে যেতে। দুর্যোগের মধ্যে বেরোলে বরং রাস্তায় সমস্যায় পড়ার ব্যাপার থেকে যায়। প্ল্যান ক্যান্সেল করতে হল তাকে।

অনেকদিন পরে বাড়িতে এসে শ্রাবন্তী অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। নিজের ঘর, নিজের সবকিছু নিয়ে বরাবরের মতোই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রূপম টিভি দেখতে চেষ্টা করছিল। মোমের খবরটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিউজ চ্যানেলগুলি দেখাচ্ছে দেখে টিভি বন্ধ রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ভিজছিল কিন্তু খেয়াল ছিল না। শ্রাবন্তী তাকে ভিজতে দেখে বলল, "ছাদে যাবে? ভিজবে?"

রূপম একটু চমকাল। শ্রাবন্তী হঠাৎ ভেজার কথা বলায় অবাক হল সে। এই মুড চেঞ্জ হওয়া যে বাড়ি ফেরার আনন্দের সাথে যুক্ত সেটা বুঝল। সে বলল, "নাহ, এখানেই

ভিজি। যা গরম ছিল।” আসলে সে কথাটা বলল বটে কিন্তু সে যে ইচ্ছা করে ভিজছিল না সেটা আর বলল না।

শ্রাবন্তী জোর করল না। বলল, “স্নান করে নিয়ো। নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে।”

রূপম একটা চেয়ার নিয়ে বসল। তাদের বাড়িতে থাকলে যেরকম বৃষ্টি উপভোগ করা যেত, এই জায়গাটা ঠিক সেরকম না। তবুও অনেককেই দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ভিজছে। অনেকদিন প্রচুর গরম পড়েছিল। বৃষ্টিটা হয়ে তাই আবেগের বিস্ফোরণ হয়েছে।

বাড়িতে ফোন করার কথা ভাবছিল সে। বাড়িতে খবর দেওয়াটা দরকার ছিল। মোবাইলটা ড্রয়িংরুমে রেখে এসেছে। মোমের দাদাকেও ফোন করে বলে দেওয়া দরকার ফিরবে না সে।

আসলে কি ভালোই হল ব্যাপারটা? যদি যেত, তাহলে ঠিক কী সান্ত্বনা দিত সে মোমের মাকে? বৃষ্টির মধ্যেও রূপমের চোখের সামনে মোমের শরীরটা ভেসে উঠতে লাগল বারবার।

সে কি কোনওদিন মোমের শরীর কল্পনা করেনি? করেছে তো। তারা যখন প্রেম করত, কল্পনায় অনেকবারই মোমকে নগ্ন ভেবেছে সে। প্রেমে তো অবধারিতভাবেই শরীর এসেছিল। মোমকে প্রথম চুমু খাওয়ার সময় শরীর জেগেছিল।

মোম তো তাকে দিয়েই দিয়েছিল নিজেকে। ভয় পেয়ে সে-ই সরে এসেছিল তখন। তারপরেই বাবার সেই ঝামেলা। অনেক চেষ্টা করেছিল সে মোমকে মুছে ফেলতে।

ধর্ষিত নগ্ন শরীরটা সেই ভুলে যাওয়াগুলিকে বারবার ফিরিয়ে আনছে কেন? তবে কি তারও মধ্যে একটা ধর্ষক লুকিয়ে আছে? আর ভাবতে পারল না রূপম। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

একটা শরীর তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কাল থেকে। রূপম ঠিক করে উঠতে পারছে না আসলে মোম তাকে তাড়া করছে, না ওই নগ্ন শরীরটা। যে শরীরটা সে অনায়াসে কাছে পেতে পারত, একটা অচেনা অজানা ধর্ষক সেই শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করেছে, আঘাত করেছে বারবার। ছ-মাস সাতমাস পর পর এলাকায় একটার পর একটা ধর্ষণ করে যাচ্ছে লোকটা। কারও না কারও বাড়ির মেয়েকে পৈশাচিকভাবে মেরে চলেছে। রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করছে আর কেউ কিছু করতে পারছে না। রূপমের ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এই ধরনের লোকের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। কুকুরের মতো টেনে হিঁচড়ে মেরে ফেলা উচিত এদের।

স্নান সেরে বেরিয়ে শ্রাবন্তীর ঘরে ঢুকল সে। এখানে এলে এই ঘরেই থাকে সে। চুল আঁচড়াতে যাবে হঠাৎ শ্রাবন্তী এল। বলল, "আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

রূপম বুঝল হোম অ্যাডভান্টেজ নেবার সময় এসে গেছে শ্রাবন্তীর। সে চুল আঁচড়ে খাটের ওপরেই বসল। বলল, "বল।"

শ্রাবন্তীও বসল। একটু দূরত্ব রেখে। তারপর বলল, "তুমি মেয়েটার কথা কোনওদিন বলোনি তো।"

রূপম শ্রাবন্তীর চোখে চোখ রাখল। বলল, "বলিনি কারণ ওই সম্পর্ক থেকে আমিই নিজে থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপরে কোনওরকম যোগাযোগ রাখিনি।"

-বেরিয়ে এসেছিলে কেন? কোনও ঝামেলা হয়েছিল?

-স্কুল লাইফ থেকে কলেজ লাইফে প্রেম ছিল। বাবা তারপরে জানতে পেরে খুব ঝামেলা করেছিল। আমি সেই সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আগে নিজের পায়ে দাঁড়াব তারপর এইসব সম্পর্কে জড়াব। সেসময়ে বেরিয়ে আসার পরে আর ওর সাথে সেরকম কোনও যোগাযোগ রাখিনি।

শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "তুমি তাহলে কাল সকালেই জানতে পারলে ওকে তুমি এখনও ভালোবাস?"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বাইরে বৃষ্টি কমছিল আর ঘরের ভিতর এক অস্বস্তিকর নীরবতা দুজনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করল।

২৯ মিলি

উফ, আজ পাগলটা যা কাণ্ড করল!!! এখনও ভাবতেই হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বাজারের মুদির দোকানের কাকুটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন সবে পড়ে ফিরেছি। হঠাৎ পাগলাটা কাকুকে তাড়া করেছিল। উনি একদৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন। আর পাগলটা তখন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁত মুখ খিঁচাচ্ছে।

এত হাসি পেয়ে গেছিল ওনার রিঅ্যাকশান দেখে। কিন্তু হাসতেও পারছিলাম না। বাবা তো কাকুকে দেখে ঘরে বসাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। আমি ঘরে এসে দিদিকে ব্যাপারটা বলে দুজনে মিলে খুব একচোট হাসলাম। পাগলটা আজকাল যা শুরু করেছে না! কোনদিন না পাবলিক পিটিয়েই দেয় ওকে। তবে ও কিন্তু আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে এটা বলতেই হবে। মা দুপুরে ভাত দেয় রোজ। চুপচাপ খেয়ে নেয়। কোনও কথা বলে না। অন্য সময়টা পাড়ার কুকুরগুলোর সাথে সিভিল ওয়ারে নামে। এ ওকে তাড়া করছে তো ও তাকে তাড়া করছে।

দিদি একদিন ওকে লুচি খাইয়েছিল। চিনি দিয়ে। সে কী খুশি! অনেকক্ষণ লুচিটাকে দেখে তারপরে খেল।

মুদির দোকানের কাকুটা বাবার সাথে কথা বলতে বলতে প্রায়ই বাইরে তাকাচ্ছিল। শেষমেষ আমি বলেই দিলাম, "কাকু, ভয়ের কিছু নেই, পাগলটা আমাদের কথা শোনে, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো।"

কাকুটা আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। শেষে আমিই বললাম, "আচ্ছা চলো, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দি।"

পাড়ার মোড় অবধি কাকুটাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। বেজায় হাসি পাচ্ছিল। ওদিকে যখন এগোচ্ছিলাম পাগলটাও আমাদের পিছু পিছু আসছিল। কাকু একবার সামনের দিকে হাঁটে, আর তারপরেই পিছন ফিরে দ্যাখে পাগলটা কামড়াতে আসছে নাকি।

মোড়ের দোকান থেকে পাগলটাকে একটা বিস্কুট কিনে দিলাম। পাগলটা বিস্কুটটা দেখে আমার সাথে ফিরতে লাগল।

বাড়ি ফিরে মা আবার বেজায় বকা দিল, "তুই পাগলটার কাছে যাস না বেশি। কখন কামড়ে-টামড়ে দেবে তখন বুঝবি কেমন লাগে। জলাতঙ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে শেষে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কুকুরে কামড়ালে তো জলাতঙ্ক হয় জানতাম মা, পাগলে কামড়ালেও হয়?"

মা গজগজ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল, "রূপমকে একটা ফোন কর তো। ছেলেটা ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।"

আমি ফোন করলাম। বেশ কয়েকবার রিং হয়ে গেল। দাদা ফোনটা ধরল না। মাকে সেটা বলতেই মা গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখ আবার কী পাগলামি শুরু করল, বউমার সাথে আবার ঝগড়া না করে। ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না।"

দিদি বলল, "আমার দাদা ওরকম না। খামোখা বউদির সাথে ঝগড়া করতে যাবেই বা কেন? বরং বউদিই তো বেশি খুঁতখুঁত করে দেখেছি।"

মা গোমড়া মুখে বলল, "ও তোরা বুঝবি না। বউকে তো ওকেই নিজের মতো করে নিতে হবে। মেয়েটা একটু রগচটা বটে কিন্তু বয়সটা তো কম। ও যেরকমই হোক,

রূপমেরও ওকে সময় দেওয়া উচিত। কালকে ওর সাথে ওরকম না করলেই পারত ছেলেটা।"

দিদি বলল, "দাদা কী করবে? দাদার কি আর মাথা ঠিক ছিল কাল? আমারও তো ইচ্ছা করছিল একছুটে গিয়ে মোমদিকে দেখে আসি। আমি তো এখনও ভাবতে পারছি না..."

দিদির গলাটা ধরে এল। মা বলল, "আমি কি আর ভাবতে পারছি রে? কত ভালো মেয়ে ছিল একটা। লাখে একটা পাওয়া যায় এরকম মেয়ে। যেমন ভালো ব্যবহার, তেমন তার কথাবার্তা", একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা।

আমার ফোনটা বেজে উঠল। দাদা। ফোন ধরতেই বলল, "কী রে ফোন করেছিলি?"

-হ্যাঁ। মা জিজ্ঞেস করছে তুই আজ ফিরছিস তো?

-না রে এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কাল যাওয়ার চেষ্টা করছি।

ফোনটা কেটে গেল। মা আর দিদি দেখি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মাকে বললাম দাদা থেকে যাবে।

মা খুশি হল, "ভালো হয়েছে। থাকুক। ওর ওখানেই থাকা উচিত। আমি ভাবছিলাম বলি। তারপর দেখলাম ওতে যাও বা যাবার জন্য বলেছিলাম, পরে যদি ভেস্তে যায়, তাই আর বললাম না। থাক ওখানে। একসাথে থাক দুজনে।"

দিদি বলল, "মা কাল একটু বেরোব। টিউশনের নোটসের জন্য। অবশ্য অয়ন থাকবে সাথে।"

মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "অয়ন যেন বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে যায়। যা দিনকাল পড়েছে আজকাল।"

আমার খুব রাগ হল কথাটা শুনে। অয়নদার সাথে টিউশনের নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে অ্যাপো মারা হবে? দাঁড়া দেখছি তোকে।

ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, "এক কাজ কর না দিদি, অয়নদাকে বল নোটসগুলি নিয়ে আসুক। যা দিনকাল পড়েছে। একা যাবি?"

দিদি রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকাল। আগের দিন হলে নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেতাম। তারপর বলল, "অয়ন আমাদের চাকর না মিলি। এটা বোঝার চেষ্টা কর।"

আমি বললাম, "আর ওই সিনেমা পেন ড্রাইভে করে আনার দরকার হলে তখন অয়নদা আর চাকর থাকে না, না?"

দিদি রেগে আমার কানটা মুলে দিল, "বেশি পাকা হয়েছ না? চুপচাপ নিজের কাজ কর। পড়াশোনা করতে বস।"

আমিও দিদিকে চিমটি কেটে দিলাম। লেগে গেল দুজনে।

৩০

রূপমের শেষরাতে ঘুম এসেছিল। শ্রাবন্তী ঘুমিয়ে পড়েছিল আগেই। রাতে খিচুড়ি ডিমভাজা রাঁধল শ্রাবন্তী। নিজে থেকেই মা-র সঙ্গে রান্না করল। শ্রাবন্তীর বাবা অফিস থেকে ফেরার পর রূপমের সঙ্গে মোমকে নিয়েই কথা বলে গেলেন। তিনি মোমকে চেনেন না। তাদের এলাকার ঘটনা টিভিতে বারবার দেখানো হচ্ছিল বলে সেটা নিয়েই কথা হচ্ছিল। রূপম বলল না মোমের ব্যাপারে কিছুই। গোটাটাই ওপর ওপর দিয়ে গেল।

রাতে সেই সমস্যাটা ফিরে এল। শুল কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শ্রাবন্তী শুয়ে পড়েছিল। বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে তারপরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রূপম। অনেক ঘরেই এখনও লাইট জ্বলছে। নিশাচর হয়ে পড়ছে মানুষ। আগে তাড়াতাড়ি ঘুমাত, এখন ইন্টারনেট জাগিয়ে রাখে সারারাত। বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে ঠান্ডার আমেজটা ছিল। অবশ্য শ্রাবন্তীর ঘরে এসি আছে। রূপম রাত দুটো অবধি বারান্দায় বসল। তারপর এপাশ-ওপাশ করতে করতেই ঘুম এল।

সকাল আটটা নাগাদ শ্রাবন্তী ঘুম ভাঙাল তার। রূপম ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "এখন তুললে কেন? আর-একটু ঘুমিয়ে নিতাম।"

শ্রাবন্তী ভারী গলায় বলল, "ওঠো, কথা আছে।"

রূপম বুঝল না আবার কী হল। এই তো আগের দিনই ঠিকঠাক ছিল। সে উঠে বসল। বলল, "এবার বলো।"

শ্রাবন্তী বলল, "ডাক্তার আন্টির কাছে যেতে হবে। আজই।"

রূপম বুঝল না হঠাৎ ডাক্তার এল কোত্থেকে। সে বলল, "কী হল আবার? ডাক্তার কেন?"

শ্রাবন্তী ধরা গলাতেই উত্তর দিল, "আমি প্রেগন্যান্ট, টেস্ট পজিটিভ দেখছি।"

রূপম ভুলেই গেছিল আসলে এই কারণেই তারা শ্রাবন্তীর বাড়িতে এসেছে। কথাটা শুনে হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল তার। এই কথার প্রতিক্রিয়ায় সে খুশি হবে না দুঃখ পাবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

সে বলল, "ডাক্তার আন্টির কাছে কেন যাবে?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর গলায় বলল, "বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস চাইল্ড নাও। এখনও অনেক কিছু দেখার আছে আমার। এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমাদের অ্যাব্রোড ট্যুরটাই তো এখনও হল না। এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে?"

রূপম চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "সে তুমি যা ভালো বোঝো করো, আমি আর কী বলব। আমি দাঁত মেজে নি।"

উঠল রূপম। সে ঠিক করল এই বিষয়ে শ্রাবন্তীকে আর একটা কথাও বলবে না। যা ইচ্ছা করুক। একটু পরে দাঁত মাজতে মাজতেই অবশ্য প্রশ্নটা মাথায় এল তার। বেরিয়ে বলল, "আচ্ছা তোমার যা দেখার আছে সেটা বাচ্চা হলে দেখা যাবে না কেন?"

শ্রাবন্তী বলল, "অত তোমাকে বোঝাতে পারব না। ওখানে একা একা থাকি। বাচ্চা হলে সামলাবে কে? নিজে তো সারাক্ষণ অফিসেই বসে থাকবে। এদিকে আমি রান্না করব না বাচ্চা সামলাব?"

রূপম ঠান্ডা গলায় বলল, "বাড়িতে থাকবে যখন বাচ্চা ছোটো থাকবে। আমার মা আছে, রূপসী আছে, মিলি আছে।"

শ্রাবন্তী জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বলল, "আর তুমি সেসময়টা গুরগাঁওতে লীলা করবে তাই তো?"

রূপম মাথা গরম করল না। সে জানে শ্রাবন্তী এই কথাগুলো বলছে তাকে রাগিয়ে দিতে। সে মুখ মুছল টাওয়েল দিয়ে। তারপর বলল, "সকালে লুচি হবে তো আজ?"

শ্রাবন্তী বলল, "আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও। আমি ওই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে বাচ্চা নিয়ে পড়ে থাকব আর তুমি গুরগাঁওতে মজা মারবে?"

রূপম বলল, "তুমিই তো বলছ তোমার একা থাকা ওখানে সমস্যা। তাই বললাম। আর-একটা কাজও তো করতে পারো, তুমি এখানে থেকে যাও বাচ্চাটা যতক্ষণ ছোটো থাকবে। ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে তাহলে আর থাকতে হল না তোমায়। সেটা কেমন হয়?"

শ্রাবন্তী বলল, "আমি এখন নিতে চাই না।"

রূপম বলল, "কবে নিতে চাও। বলো।"

শ্রাবন্তী তার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "অন্তত তিন থেকে চার বছর পরে।"

রূপম কাঁধ ঝাঁকাল, "দ্যাখো, তুমিই সিদ্ধান্ত নাও। আমার তো কোনও সমস্যা নেই।"

শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওই মেয়েটার সাথে তোমার ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল? কোনওদিন কিছু করেছ?"

রূপম বুঝছিল মাথার ভেতরের আগ্নেয়গিরিটা ধীরে ধীরে জাগছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল সে, পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মাঝে মাঝেই আজকাল এই টাইপের কথাবার্তা শুনতে হবে তাকে। কিছুই বোঝেনি এমন মুখ করে বলল, "কী করেছি? সেক্স?"

শ্রাবন্তী চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ। ফার্স্ট লাভ তো। নিশ্চয়ই করেছ তাই না?"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "বিয়ের আগে তো আমি সোনাগাছিও গেছি। তোমায় বলিনি। এখন বললাম।"

শ্রাবন্তী বিস্ফারিত চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "আর ইউ সিরিয়াস?"

রূপম আবার আধশোয়া হল বিছানার ওপরে। তারপর বলল, "তুমি তো অনেকরকম থিয়োরি খাড়া করছ, এটা আমি আমার তরফ থেকে অ্যাড করে দিলাম। কেমন থিয়োরিটা? ভালো না? দ্যাখো না, এ তো হতেই পারে কলেজে পড়তে পড়তে বন্ধুদের সাথে গেলাম। হতে পারে না?"

শ্রাবন্তী বুঝতে পারছিল না রূপম ঠিক বলছে না তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সে বলল, "হতেই পারে। কে দেখতে যাচ্ছে?"

রূপম বলল, "তাহলে সেরকমই কিছু একটা ধরে নাও। কল্পনায় বিরিয়ানিই যখন রাঁধবে তখন ভালো করে মশলা দাও। আর শোন, অ্যাবরশন করাবে করাও, সেটা নিয়ে আমি একটা কথাও বলব না, কিন্তু দয়া করে এসব প্রশ্ন আর ভবিষ্যতে করবে না।"

শ্রাবন্তী তার দিকে জ্বলন্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বেশ শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩১ মিলি

অয়নদা এলে আমি ওদের সামনে থেকে উঠি না। চুপচাপ বসে থাকি। কিছুতেই ফ্রি স্পেস দেওয়া যাবে না ওদের। ফ্রি স্পেস পেলেই আমার যেটুকু চান্স ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। অয়নদা আজ সকালেই এসেছে। দিদির কীসব নোট আছে সেগুলো নিয়ে। আমি ভালো মেয়ের মতো চুপচাপ বইটা খুলে রাখলাম আর ওদের দিকে কান খাড়া করে রাখলাম। অয়নদা বলছিল, "মোমদির ব্যাপারটা এখনও ভাবতে পারছি না রে।"

দিদি বলল, "এসব কথা থাক এখন। ভালো লাগছে না।"

অয়নদা বলল, "পালিয়ে থেকে আসলে কি কিছু হয়? আমার তো মনে হয় না। আমার মতে এসব ব্যাপারকে সরাসরি সামনে থেকে দেখা উচিত। আমি তো রূপমদাকে সাপোর্ট করব। সারাদিন ওখানে থাকল। জাস্ট ভাবা যায় না।"

আমি টুক করে ফুট কাটলাম, "হুঁ, আর সব দেখে শুনে বউদি ফায়ার হয়ে গেছে।"

দিদি আগেকার দিনের মুনিঋষিরা যেমন ভস্ম করে দেবার চোখ করতেন সেরকম চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব পেকেছিস মিলি। বউদি ফায়ার হয়েছে না কী হয়েছে সব বলতে হবে?"

আমি যথাসম্ভব সরল মুখ করে বললাম, "কেন রে দিদি অয়নদা কি বাইরের কেউ?"

অয়নদা আমার কথা শুনে হেসে বলল, "মিলি এত পেকেছিস কেন রে?"

দিদি বলল, "দেখ না, সারাক্ষণ শুধু টুকটুক করে যত রাজ্যের ভাট বকে যাচ্ছে। নয়তো মোবাইলে খুটখুট করে যাচ্ছে।"

অয়নদা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। সেদিন ওটা কী মেসেজ পাঠালি রে, বুঝলাম না কিছু?"

কেলো করেছে। একটা প্রেম-প্রেম মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, অয়নদা সেটাই বলে দিয়েছে। এবার আমার হয়ে গেল। যে করে হোক ম্যানেজ দিতে হবে মুখ করলাম, "আরে আমিও তো ঠিক বুঝতে পারিনি আসলে। তোমাকে ফরোয়ার্ড করলাম যাতে তুমি বুঝিয়ে দাও।"

দিদি এবার আমাকে চেপে ধরার চেষ্টা শুরু করল, "কেন আমি তো বাড়িতে ছিলাম। অয়নকে পাঠাতে হল কেন? দেখা তো কী পাঠিয়েছে।"

অয়নদা বলল, "আরে সেসব কি রেখেছি নাকি? কখন ডিলিট করে দিয়েছি। আসলেই মিলি বোঝেনি ও কী পাঠাচ্ছে।"

আমার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম হল। ওটা শুধু একমাত্র অয়নদার জন্যই পাঠিয়েছিলাম আর অয়নদা ডিলিট করে দিল? আর কিচ্ছু পাঠাব না দাঁড়াও। মুখটা অবশ্য হাসি হাসিই রাখতে হল, নইলে দিদি বুঝে গেলে বড়ো কেলো হয়ে যাবে।

দিদি বলল, "দাঁড়া দাদা আসুক, তোর মোবাইলের ব্যবস্থা হচ্ছে। খুব পেকেছিস তুই। মোবাইলটা যেন টুয়েলভ পাশ করার আগে তোকে না দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করছি।"

অয়নদা হেসে ফেলল, "এ কি আর এভাবে আটকানো যায় নাকি? ও তো যা পাকার পেকেই গেছে।"

আমি অয়নদার এই কথাগুলোর জন্যই আরও বেশি করে ওর প্রেমে পড়ে যাই। কী সুন্দর করে কথাগুলো বলে। দিদি কিছুক্ষণ গজগজ করতে লাগল। তারপর বলল, "তুই জানিস না মিলি কতটা পেকেছে। সারাক্ষণ শুধু গিন্নি গিন্নি ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অয়নদা বলল, "সেরকম থাকা ভালো। কিন্তু মিলি, তুই যে এগুলো পাঠাস সেগুলো কোত্থেকে পাস? তোকেও নিশ্চয় কেউ এগুলো ফরোয়ার্ড করে। উলটোপালটা ছেলেদের সাথে মিশিস না তো?"

ওহ... কত কেয়ার করে... আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করছিল। যথারীতি ক্যাবলার মতোই বললাম, "কেউ পাঠায় না অয়নদা। ফেসবুকের পেজগুলো থাকে না, ওখান থেকেই ডাউনলোড করে রাখি।"

অয়নদা বলল, "উফ এই এক হয়েছে। সারাক্ষণ ন্যাকা ন্যাকা পোস্টার। তুই চলে গেলি তাই আমি সর্দি ঝাড়া বন্ধ করে দিয়েছি। উফ। ডিসগাস্টিং।"

দিদি বলল, "তুই এসব পেজে কী করিস মিলি? তোর আবার এত প্রেম আসছে কোত্থেকে?"

আমি দিদির দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে বললাম, "তোকেই তো দেখলাম এই টাইপেরই কোনও একটা পোস্ট শেয়ার করলি একটু আগে, আবার আমাকে বলছিস কেন?"

দিদি রাগল, "আমি তোর থেকে বড়ো সেটা ভুলে গেলে হবে মা? তা ছাড়া তোর মতো এইসব পেজে আমি দিন রাত পড়ে থাকি না। আমার পড়াশোনা আছে, আরও অনেক কিছু আছে।"

অয়নদা হাত তুলল, "শান্তি শান্তি। গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিলি তো তোরা। এবার বন্ধ কর। তবে এটা ঠিক, মোবাইলের ব্যবহার আমাদের সবারই কমিয়ে দেওয়া উচিত। মিলিকে কালকে দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপে লাস্ট সিন রাত দেড়টা। এত রাত অবধি কী করিস মিলি?"

কথাটা শুনে আমার দুরকম প্রতিক্রিয়া হল। যাকে বলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ভালো প্রতিক্রিয়াটা হল এই, তার মানে অয়নদা আমার লাস্ট সিনটা দ্যাখে। একটু হলেও চিন্তা করে আমার জন্য। আর খারাপটা হল এত রাত অবধি দেখে থাকলে খারাপ কিছু ভাবছে না তো? তাই আগেভাগেই কাঁদুনি গেয়ে রাখলাম, "এটা মোবাইলের প্রবলেম অয়নদা। মনে হয় ফোনে কোনও সমস্যা আছে।"

দিদি থামাল, "তুই চুপ কর। রাতে তো কোনওদিনও দুটোর আগে ঘুমাস না। ইয়ার্কি হচ্ছে এখন? ফোনে সমস্যা? যতসব!!!"

আমি কটমট করে দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৩২

কলকাতার সাথে রূপমের পরিচয় কম। মফস্সলে কিংবা কলেজে থাকা অবস্থাতেও তাই দেখে এসেছে। চাকরি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাবার পর কলকাতা তো একেবারেই দূরে সরে গেছিল তার কাছে। শ্রাবন্তীর সঙ্গে বিয়ের আগে মাঝে মাঝে ঘুরেছে বেশ কিছু মলে। কিন্তু তাও ট্যাক্সি করে যাতায়াত হত। গন্তব্য বলে উঠে পড়ত, ফেরার সময়েও ট্যাক্সি। কলকাতার মধ্যে শ্রাবন্তীদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে টুরে যেতে হলে একটু অস্বস্তিই হয় তার।

শ্রাবন্তীর ডাক্তার আন্টি ফ্ল্যাটের কাছেই বসেন সেটা জেনে একটু স্বস্তি পেল সে। দুজনে মিলে যখন বেরোল তখন সন্ধে নেমেছে। শ্রাবন্তীদের ফ্ল্যাটের সামনে থেকে খানিকটা গেলেই একটা ওষুধের দোকান। সেখানেই বসেন উনি। পৌঁছে দেখা গেল বেশ ভিড় হয়েছে। নাম লেখানো ছিল না। শ্রাবন্তী আশ্বাস দিল তাকে দেখলেই নাকি উনি কাউকে দিয়ে ঠিক ডাকিয়ে নেবেন। তবু রূপম নাম লিখিয়ে নিল। বোঝা যাচ্ছিল ভদ্রমহিলা বেশ নামকরা গায়নোকলজিস্ট। রূপম চারদিক চোখ বোলাল। বেশ কয়েকজন সন্তানসম্ভবা। কেউ কেউ আগের জনকে নিয়েও এসেছে। স্বামী কাজে গেছেন হয়তো, বাড়ি ফাঁকা, কিছু করারও নেই।

শ্রাবন্তীকে বসিয়ে রূপম মোবাইলে ডেটা অন করল। কলিগদের গ্রুপে সানি লিওনই টপে যাচ্ছে এখন। যারা বেশি বয়স্ক তাদের মধ্যেই আবার এই ছবিগুলো বিতরণের প্রবণতা বেশি। প্রেম সিং বলে একজন সিনিয়র আছেন, সারাদিন এইসব পাঠিয়ে যাবেন। বলেন সানি লিওন নাকি পাঞ্জাবের গর্ব। ওদিকে ওঁর বাড়িতে উনি একজন

গম্ভীর অভিভাবক। দুই ছেলেকে সকাল বিকেল শাসনে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছেন। তবে ভাবিজি অসাধারণ রান্না করেন। প্রায়ই রূপম পঞ্জাবি খাবার খেতে চলে যায় প্রেম সিংয়ের ফ্ল্যাটে। বেশ দিলদরিয়া আমুদে লোক প্রেম সিং। গেলেই বোতল খুলে বসে পড়বেন। ছুতো পেলেই হল। শ্রাবন্তী রাগ করে দু-পেগের বেশি হয়ে গেলে। তবে ও অন্য ঘরে থাকে, ভাবিজির সাথে গল্প করে। ওই সময়ে রূপম দু-চার পেগ আরও চড়িয়ে নেয়। মিস্টার আইয়ার বলে আর-একজন সিনিয়র থাকেন। তিনিও খুব অতিথিপরায়ণ। তার বাড়িতে আবার শ্রাবন্তী বেশি যেতে চায়। সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের ভীষণ ভক্ত ও। রূপমের সাউথ ইন্ডিয়ান পোষায় না। সম্বর মশলা খুব একটা ভালো লাগে না। রূপম ভাবছিল এরকম চাকরিই তার পক্ষে সব থেকে ভালো হয়েছে। গোটা দেশের লোকেদের সাথে কথাবার্তা হয়। পশ্চিমবঙ্গে থেকে যে মানসিক সংকীর্ণতা তৈরি হয় তার থেকে রাজ্যের বাইরে চাকরি করাটা অনেক ভালো হয়েছে। বাড়ি থেকে দূরে থাকাটা যদিও একটা সমস্যা তবু হোমসিকনেসটা কাটিয়ে ফেললে বাইরে থাকাটাই অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক তার কাছে।

সে ঠিক করল ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলে শ্রাবন্তীকে নিয়ে কোনও সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যাবে। গুমোট পরিস্থিতিটা একটু কাটানো দরকার।

শ্রাবন্তী ঠিকই বলেছিল, তিন-চারজনের পরেই ডাক এসে গেল। ডাক্তার আন্টি শ্রাবন্তীকে খুব আদর করলেন। তাকে মজা করে বেশ কড়া গলায় বললেন, "আমার মেয়েকে ভালোভাবে রাখছ তো?"

রূপম হেসে ফেলল।

শ্রাবন্তী একটু ইতস্তত করে বলল, “আন্টি, আমার টেস্ট পজিটিভ এসেছে। প্লিজ কিছু করো।”

আন্টি কিছুক্ষণ শ্রাবন্তীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, “পজিটিভ এসেছে মানে?”

শ্রাবন্তী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “আমি প্রেগন্যান্ট, আন্টি!”

আন্টি একবার রূপমের দিকে আর একবার শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাতে এত দুঃখিত হবার কী আছে?”

শ্রাবন্তী বলল, “আমি এখনই কিছু চাইছি না আসলে। কিছুই তো দেখলাম না জীবনে।”

আন্টি রূপমকে বললেন, “তোমারও কি তাই মত?”

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে তাকাল। রূপম স্পষ্ট বলে দিল, “না। তবে যেহেতু পুরো প্রসেসটা ওর ওপর দিয়েই হবে তাই এই ডিসিশনটা আমি ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।”

আন্টি চেয়ারে হেলান দিলেন। একটু থেমে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে কড়া ভাষায় বললেন, “আপাতত ব্লাড টেস্টটা করা। সেটা দেখ। ডিসিশন নে কী করবি। যদি নিস তাহলেই আসবি আমার কাছে। ঠিক আছে?”

শ্রাবন্তী ফ্যাকাশে হল খানিকটা। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। আন্টি কিছু টেস্ট দিয়ে ছেড়ে দিলেন। টাকা নিলেন না।

রাস্তায় বেরোল তারা। হাওয়া দিচ্ছিল। শ্রাবন্তী বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, “তোমার ওরকমভাবে বলার কী দরকার ছিল? বলে দিলেই পারতে আমি এখন বাচ্চা চাইছি না।”

রূপম বলল, “আমি তো তোমাকে প্রথম থেকেই বলছি এসব ব্যাপারে আমার স্ট্যান্ড খুব ক্লিয়ার। অকারণ জটিলতা বাড়াব কেন? তা ছাড়া অ্যাবরশন করলে তো অনেকরকম কমপ্লিকেসি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে কে সামলাবে?”

শ্রাবন্তী আবার চুপ মেরে গেল। হাঁটতে হাঁটতে তারা বাজারের কাছে চলে এসেছিল। সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁটা দেখা যাচ্ছিল। রূপম বলল, “চলো একটু ধোসা খাওয়া যাক।”

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি তো ধোসা পছন্দ করো না!”

রূপম বলল, “তুমি তো করো। তুমি খাও, আমি ইডলি নি একটা।”

শ্রাবন্তী বলল, “থাক। ইচ্ছা করছে না খেতে।”

রূপম বলল, “চলো, খাও। তারপর কী করবে দেখা যাবে।”

অনেকক্ষণ বাদে শ্রাবন্তী হাসল। রূপমও।

৩৩ মিলি

মাঝে মাঝে পাগলের মতো কাজ করি। যে কাজটার জন্য অনেক ঝাড় খেতে হয় পরে। কিন্তু সেই পাগলামিটা করার জন্য কেন জানি না ভীষণ ইচ্ছা হয়।

রাতে শুয়েছি, দেখি দিদি মোবাইলে খুটখুট করে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল শিয়োর অয়নদাকেই মেসেজ করছে। আমিও আমার মোবাইল থেকে অয়নদাকে মেসেজ করে দিলাম, "কী করছ?"

মিনিট পাঁচেক কোনও রিপ্লাই এল না। দিদিকে দেখে বুঝলাম না অয়নদা ওকে এই নিয়ে কিছু বলেছে নাকি। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি অয়নদা রিপ্লাই করেছে, "পড়ছি।"

সাথে সাথে রিপ্লাই করলাম, "প্রেম করছ না?"

মেসেজটা পাঠিয়ে বুঝলাম বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সাথে সাথে একটা হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে যাওয়া স্মাইলি পাঠিয়ে দিলাম। অয়নদা রিপ্লাই করল, "প্রেম করব মানে? কী বলতে চাইছিস?"

আমি একটু ভাবলাম। তারপর লিখলাম, "প্রেম করবে মানে প্রেম করবে। তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে।"

রিপ্লাই এল, "আমার গার্লফ্রেন্ড? কে সে?"

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। কী উত্তর দেব ভাবতে লাগলাম। তারপর উত্তর না দেওয়াই ঠিক করলাম।

দেখি আবার মেসেজ করেছে, “কী রে, কী বলছিস খুলে বল। কিছুই বুঝতে পারছি না তো! আমার গার্লফ্রেন্ড পেলি কোত্থেকে তুই?”

আমি বুঝে গেলাম নিজেই নিজের বাঁশ টেনে এনেছি। লিখলাম, “না তোমার তো গার্লফ্রেন্ড থাকবে এটাই তো ন্যাচারাল, না? তুমি এত হ্যান্ডু।” বলে আবার একটা স্মাইলি দিয়ে দিলাম, বেগুনিমুখো শয়তানওয়ালা।

অয়নদা দেখি টাইপ করছে। আমি এবার আড়চোখে দিদির দিকে তাকালাম। দিদিও টাইপ করছে।

হঠাৎ কেমন যেন একটা খটকা লাগল। দিদি অয়নদাকেই মেসেজ করছে তো? নাকি অন্য কাউকে? ব্যাটা বিরাট চাপা স্বভাবের মেয়ে। পেটে বোম মারলেও ওর পেট থেকে কিছু বের করা শিবেরও অসাধ্য।

মা প্রায়ই বলে রূপসী আর মিলি যে কী করে বোন হল কে জানে। একটা তো কিছু হলেই ঢাক ঢোল নিয়ে গোটা পাড়া রাষ্ট্র করতে বেরিয়ে যায়। আর-একটা আছে, কিছুতেই কিছু বলবে না।

আমি তখন দিদিকে খ্যাপাতে বলি, “মা দিদির নাম চাঁপা রাখতে পারতে।”

দিদি কটমট করে আমার দিকে তাকায়।

সেই দিদি এখন কাকে টাইপ করছে? অয়নদাকে? আমার নিজের মাথায় একটা গাঁট্টা মারতে ইচ্ছা হল। সেদিন যখন দিদির মোবাইল প্যাটার্ন লক ভেঙে দেখছিলাম, অন্য মেসেজগুলো একটাও দেখিনি। অয়নদার নামটা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটায় কী লেখা আছে সেটাই দেখছিলাম। আমার উচিত ছিল দিদির অন্য মেসেজগুলো পড়া।

সেদিনের পরে দিদি কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। মোবাইলের প্যাটার্ন লক চেঞ্জ করে দিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি। জাসুসি করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। ও যখন মোবাইল ঘাঁটে আমি শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। আনলক করার সময় খুব সতর্ক হয়ে যায় আজকাল। তবুও পালিয়ে যাবে কোথায়।

আমার হাত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অত সোজা নাকি!

অয়নদার রিপ্লাই এল, "আমি হ্যান্ডু? কোত্থেকে এসব শিখছিস মিলি? গাঁট্টা খাবি?"

আমি ফিউজ হয়ে গেলাম। যাহ্বাবা, যার ওপর আমার ক্রাশ সে যদি বলে বসে গাঁট্টা মারবে, সেটা কেমন একটা ইয়ে ইয়ে ব্যাপার হয়ে যায়!

কিছু না লিখে আবার সেই হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে যাওয়া স্মাইলিটা পাঠিয়ে দিলাম।

অয়নদা রিপ্লাই করল, "তুই কি আবার বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে ফেললি নাকি? বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে। পুঁচকি পুঁচকি মেয়েদেরও বয়ফ্রেন্ড দেখছি চারিদিকে।"

আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "আমি মোটেও পুঁচকি না অয়নদা। তা ছাড়া আমার বয়ফ্রেন্ড না থাকলেও আমার অনেক বন্ধুদেরই আছে। আর সেটা যথেষ্ট ম্যাচিওর রিলেশনশিপ। তোমার আর দিদির মতোই।"

এই সেই কেলো। মেসেজটা পাঠিয়েই বুঝলাম অতি উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হয়ে আসলে বিরাট বাঁশ নিজেকেই নিজে দিয়ে দিয়েছি।

অয়নদা কী রিপ্লাই করল সেটা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করলাম না। ফোনটা বন্ধ করে দিলাম।

অয়নদা দিদির সাথে আদৌ প্রেম করে কি না সেটা নিয়েই আমি কনফার্ম নই, এদিকে এটা লিখে দিলাম। যদি করেও থাকে, তাহলেও আমার ঝাড় খাবার সম্ভাবনা প্রবল, না করে থাকলে তো হয়েই গেল। পুরো শহিদ হয়ে গেলাম।

ফোনটা দূরে সরিয়ে রেখে ঠিক করলাম আগাম জামিন নিয়ে রাখি। দিদিকে জানিয়ে রাখতে হবে ঠারেঠোরে। নইলে আরও বড়ো কেচ্ছা অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

বললাম, "এই দিদি।"

দিদি মোবাইলের দিকে চোখ রেখেই বলল, "বল।"

"বলছি, অয়নদা কি তোর বয়ফ্রেন্ড?" খুব নিরীহ গোবেচারা গলায় করলাম প্রশ্নটা।

দিদি এবার ফোনের থেকে মুখ সরাল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মিলি... তুই কিন্তু এবার খুব পেকেছিস। এবার মার খাবি।"

আমি সেই গোবেচারা মুখেই বললাম, "আসলে অয়নদাকেও এখনই এই প্রশ্নটা করলাম তো।"

দিদি শুয়ে ছিল। উঠে বসে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকল।

৩৪

এক-একটা সকাল সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আগের রাতে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার পর একটা ঝলমলে সকাল কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখকষ্ট সব একদিকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

ভোর ছ-টাতেই ঘুম ভেঙে গেল রূপমের। আগের দিনের বৃষ্টি এখন আর নেই। সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। সকাল ছ-টা মানে রীতিমতো সকাল। সবাই বেরিয়ে গেছে কাজে। গুরগাঁওতে থাকলে সেও উঠে পড়ে এই সময়টা। মাঝে মাঝে মর্নিং ওয়াকেও যায়। মোবাইলটা সুইচ অফ করে রাখা ছিল। এবার অন করল। বেশ কিছু মেসেজ এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে। অফিস কলিগদের গ্রুপে ঢুঁ মারল না আর। এদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, সারাক্ষণ আদিরসাত্মক কথা বলে চলেছে।

হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্টসদের স্ট্যাটাসগুলো দেখছিল সে। এক-একজন বড়ো বড়ো কথা লিখে রেখেছে। বাণীগুলো দেখে হাসি পেয়ে গেল রূপমের। এত কথা বলার কি সত্যিই দরকার? সবকিছুই এত লোক দেখাবার জন্য কেন করা হয়? নিজেকে মাঝে মাঝে ব্যাকডেটেড মনে হয়।

বাপ্পার একটা মেসেজে চোখ পড়ল তার। একটা পেপার কাটিং পাঠিয়েছে। মোমের খবরটা করেছে এক কাগজ। এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল সে। সবকিছুরই রাজনীতিকরণ করাটা এই দেশের বদভ্যাস হয়ে গেছে। কোথায় তদন্ত হবে তা না, রাজনীতিকরা থানায় ইট মারল, মন্ত্রী বলে দিল ওসি চেঞ্জ হবে, যেন ওসি চেঞ্জ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রূপমের মনটা আবার তেতো হয়ে গেল।

শ্রাবন্তী উঠে পড়েছিল। আর-একবার ইউরিন কালার টেস্টটা করবে বলছিল, সেটা করতেই ঢুকেছিল বাথরুমে। বেরিয়ে স্ট্রিপটা নিয়ে তার কাছে চলে এল। রূপম দেখল। আর-একবার রেজাল্ট পজিটিভ।

সে বলল, "তাহলে কনফার্ম?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর মুখে বলল, "আর কী!"

রূপম বলল, "টেস্টগুলো তো বাড়িতেই এসে করে যাবে?"

শ্রাবন্তী বলল, "হ্যাঁ ওই ব্লাড নেবে।"

রূপম বলল, "তোমার মাকে বলেছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "মাকে বললে তো হয়েই গেল। লাফাতে লাফাতে পাড়াময় রাষ্ট্র করতে শুরু করে দেবে। তার আগে তো আমাদের সিদ্ধান্তটা নিতে হবে তাই না?"

রূপম কাঁধ ঝাঁকাল, "আমার সিদ্ধান্ত তো বলেই দিয়েছি। নাও।"

তার কথা শুনে শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "হ্যাঁ। তুমি তো তাই বলবে। আমার কথা আর ভাববে না।"

রূপম কিছু বলল না। শ্রাবন্তী অধৈর্য হল, "কী হল? কিছু তো বলো।"

রূপম বলল, "যা বলার বলে দিয়েছি। এবার তুমি বলো।"

শ্রাবন্তী চেয়ার টেনে বসল। তারপর বলল, "তুমি তো অফিসে চলে যাবে। তারপর সারাদিন বাচ্চা আমাকে দেখতে হবে। রান্না আছে তার ওপর। আমি পারব?"

রূপম বলল, "লোক রেখে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া সবাই এভাবেই বাচ্চা নেয়। তুমি তো হাউসওয়াইফ। অফিস করেও কতজন বাচ্চা নিচ্ছে।"

শ্রাবন্তী বলল, “যারা নিচ্ছে তারা ঈশ্বর। আমি পারব না। তা ছাড়া কত কিছু করার ছিল আরও। এখন বাচ্চা হয়ে গেলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কোথাও তো ঘুরতেও যাওয়া হল না সেরকম। এখনই বাচ্চা?”

রূপম বলল, “বেশ তো। তুমিই ঠিক করো কী করবে। ঘুরবে বলে বাচ্চা নষ্ট করে দেবে? এরপরে যদি আর না হয় তখন কী করবে?”

শ্রাবন্তী হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বলল, “আমি এখন কিছু বললে তো আমিই খারাপ হয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার আন্টি, মা, তুমি, কেউ তো আমার কথা বুঝতে চাইছ না। আমি হাসপাতাল ভয় পাই। রক্ত... উফ... জাস্ট ভাবতে পারছি না।”

রূপম বলল, “তুমি যদি অ্যাবর্ট করো তাহলেও তো এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তোমাকে যেতে হবে, তাই না?”

শ্রাবন্তী আবার চুপ করল। তারপর বলল, “পারব? আমি? তোমার কী মনে হয়?”

রূপম হাসল, বলল, “এবার তোমার মা বাবাকে বলো।”

শ্রাবন্তী লজ্জা পেল, “মাকে বলতে পারব। বাবাকে বলা যাবে না।”

রূপম বলল, “আচ্ছা। তাই কোরো।”

শ্রাবন্তী উঠল। “আচ্ছা। যাই।”

হঠাৎ রূপমের ভালো লাগল খুব। অনেকক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

৩৫

সকাল থেকে তিনটে মশা কেটেছে। গোকুলবাবু একটু ভয়ে ভয়ে আছেন। পাগল সাজা সবাই যত সোজা মনে করে ব্যাপারটা মোটেও অতটা সোজা না। নেহাত পেটের দায়। নইলে চাদ্দিকে যা ডেঙ্গি চলছে কার দায় পড়েছিল এই ধ্যাদ্ধেরে মফস্সলে পাগল সেজে বসে থাকার!

খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে শুরু থেকেই। সামনের বাড়ির দয়ালু মেয়েটা গোকুলবাবুকে দুপুরে আর রাতে একটু খেতে দেয়। নইলে খাওয়াটা নিয়ে সত্যিই চাপ হয়ে যায়।

বাজারে সকালে একটা কচুরির দোকানের সামনে গিয়ে বসেন তিনি। চুপচাপ জুলজুল করে কচুরির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম দোকানদার তাড়িয়ে দিত। পরে দেখল এ পাগল নাছোড়বান্দা আছে। অগত্যা দুটো কচুরি আর একটু তরকারি শালপাতার বাটিতে করে দিত।

আপাতত এই ব্যবস্থাই আছে। দাড়ি বেশ বড়ো হয়েছে। বহুদিন স্নান করেন না তিনি। সে অভ্যাসও হয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে বিরক্ত যে একেবারে লাগে না সে কথা বললে ভুল হবে। তখন মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যান।

চলেও যেতেন, কিন্তু ওই মেয়েটার জন্যই আটকে আছেন। আজকাল মনে হয় প্রেমেই পড়ে গেছেন মেয়েটার। অবশ্য মেয়েটার দিক দিয়ে এরকম কোনও সিগন্যাল আসা সম্ভব না। রাস্তার পাগলের সাথে কোনও মেয়ে প্রেমে পড়বে এটা কোনও সিনেমাতেও সম্ভব না।

গোকুলবাবু তবু মাঝে মাঝে ঝিমুনির ফাঁকে নিজের ছোটোখাটো সংসারের স্বপ্ন দেখেন। রূপসী থাকবে আর তিনি থাকবেন, একটা ছোটো মেয়ে থাকবে, বড়ো সাহেবকে পরিষ্কার বলা থাকবে পাগলের ডিউটি অনেক হয়েছে, এবার তিনি সিনিয়র হয়েছেন, দয়া করে রেহাই দেওয়ার কথা চিন্তা করা হোক।

ভোরের স্বপ্নটাও সেরকমই দেখছিলেন তিনি। বেশ একটা ঘোর ঘোর লেগেছিল। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগছিল তার। ঘুম থেকে উঠে পাড়ার কলে মুখ-টুখ ধুয়ে নিলেন। লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে পাগলে। এখন আর কেউ কিছু বলেও না। প্রথম প্রথম পাড়ার ছেলেরা ঢিলও ছুঁড়েছে। দু-চারটে ঢিল, চড়চাপড়, গণধোলাই খাওয়া, সমস্ত ট্রেনিংই থাকে তাঁদের। ধীরে ধীরে পাড়ার ছেলেপিলেও হাল ছেড়ে দিয়েছে। পাগল থিতু হয়ে গেছে পাড়ায়।

বাজার টহল দিতে বেরোলেন গোকুলবাবু। দু-দিন আগে রূপসীদের বাড়ির রাস্তায় বাজারের এক দোকানদারকে মিলিকে ফলো করতে দেখেছিলেন তিনি। ঠিক করলেন তার দোকানের সামনে গিয়েই বসবেন। সিক্সথ সেন্স কিছু কিছু কথা বলে তাঁকে, গোকুলবাবু জানেন, এই কাজে সিক্সথ সেন্স প্রবল থাকা বড়োই জরুরি। ডিপার্টমেন্টের লোকেরা বলে গোকুলের সিক্সথ সেন্স প্রবল, কিন্তু এটা একটা লাইফ হল? গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাজারের দুটো কুকুর পিছু নিয়েছে তাঁর। গোকুলবাবু দৌড়োন না। দৌড়োলে কুকুর বুঝে যায় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তখন আরও বেশি করে তাড়া দেয়।

নারানের দোকানের সামনে গিয়ে চুপচাপ বসেন তিনি। ছ-মাসের না-কামানো দাড়ি, চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, লুঙ্গি, স্নান-না-করা উশকোখুশকো চেহারার গোকুলবাবু চুপচাপ বসে থাকেন।

নারান দোকানে এসে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্মী আর গণেশ পুজো করে। পাগলটাকে বসতে দেখে বিরক্ত হল। কাল এই পাগলটাই তাকে তাড়া করেছিল, এখন আবার গন্ধে গন্ধে চলে এসেছে। দোকানের ছেলেটা আজ আসেনি। কোথায় গেছে দিদির বিয়ে ইত্যাদি বলে। প্রায়ই ছুটকোছাটকা ছুটি নিচ্ছে আজকে ছেলেটা ।

নারান পুজো দিতে দিতেই ভাবতে লাগল পাগলটার হাত থেকে কীভাবে বাঁচা যায়। তার চোয়াল শক্ত হওয়া শুরু করল, ধর্ষণ করে খুন করা একটা নেশার ব্যাপার কিন্তু স্বাদবদলের জন্য একটা পাগল খুন করতে কি খুব ঝামেলা হবার কথা?

৩৬ মিলি

ছেলেগুলো যে কবে কথা বলতে শিখবে!

এইজন্য আমার নিজের বয়সি ছেলে একদম পছন্দ হয় না। একটা ছেলে দেখলাম না যে অয়নদার মতো কথা বলতে পারে।

কোচিং থেকে ফিরছিলাম। সকালবেলা। তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেছিল বলে ভালোই লাগছিল। ক্লাসটেস্ট নেবেন, স্যার এইসব ভুজুংভাজুং দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ফাঁকিবাজির মুডে ছিলেন। বাড়ি এসে টিভি দেখব বলে তাড়াতাড়ি আসছিলাম, এই সময়েই একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এসে হঠাৎ করে বলল, “এই তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?”

আমি বললাম। ছেলেটা তারপরে আর কথা খুঁজে পায় না। মানে বাড়ি থেকে মনে হয় একটা ডায়লগই মুখস্থ করে এসে বলে দিল।

আমি কোথাও গেলাম না। ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড ধরে আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বললাম, “তুমি আর কিছু বলবে?”

ছেলেটা সাইকেলটা বাঁইবাঁই করে চালিয়ে চলে গেল। আমি একা ছিলাম। আমার খুব হাসি পেয়ে গেল।

বাড়িতে দিদিকে এসে বলতেই দিদি আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, “তুই কথা বলতে গেলি কেন?”

আমি বললাম, “কেন? কথা না বলার কী আছে? কথা বললে কি গায়ে ফোসকা পড়ে? তুইও তো অয়নদার সঙ্গে কথা বলিস, আমি কিছু বলতে গেছি?”

দিদি আমার দিকে কটমট করে খানিকক্ষণ চেয়ে বলল, "খুব বেড়েছিস তুই। দাঁড়া দাদা এবার ফিরুক, তোর মোবাইলটা যদি না নিয়েছি তোর কাছ থেকে।"

আমি বললাম, "এই তোর শুধু আমার মোবাইলটার দিকে নজর কেন রে? এর মধ্যে আমার মোবাইলটা এল কোত্থেকে?"

দিদি বলল, "এই মোবাইলের জন্যই তুই এত পাকা পাকা কথা বলছিস। তোকে না মা বারবার বলেছে রাস্তায় অজানা অচেনা ছেলেদের সঙ্গে একদম কথা বলবি না? খুব পেকেছিস তুই।"

আমি দিদিকে একটা ভেংচি কেটে ছাদে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি পাগলটা কোত্থেকে একটা মুরগির ঠ্যাং জোগাড় করেছে। আমাকে দেখে মিটমিট করে তাকাল আমার দিকে। তারপর ঠ্যাংটা দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগল। আমি বেশ খানিকক্ষণ পাগলটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর আমিও পাগলটাকে একটা ভেংচি কাটলাম। সেটা দেখে পাগলটা খুব মজা পেয়ে গেল। আমি পাগলটাকে আবার ভেংচি কাটলাম। পাগলটা জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে ঠ্যাংটা এমনভাবে চিবোতে লাগল যেন ঠ্যাংটা ছিঁড়েই খেয়ে নেবে। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম। পাগলটা তারপর আমাকে দেখে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলামি দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি একটা পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। কয়েকজন পুলিশ নেমে আমাদের বাড়ির কলিংবেল টিপল।

আমি সেটা দেখে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। মা রান্নাঘরে ছিল। আমাকে দেখে ইশারায় সামনের ঘরে যেতে বারণ করল। আমি ছটফট করছিলাম। দিদিও রান্নাঘরেই ছিল। বুঝলাম বাবার সঙ্গে পুলিশেরা কথা বলছে।

মিনিট দশেক পরে ওরা চলে যেতেই আমরা সামনের ঘরে গিয়ে দেখি বাবা চুপ করে বসে আছে। মা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "কী হল? পুলিশ এসেছিল কেন?"

বাবা একবার মা-র দিকে আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "রূপমকে খুঁজতে। আমি যখন বললাম এখন কলকাতা গেছে, বলল ফিরলে থানায় গিয়ে যেন দেখা করে।"

দিদি বলল, "দাদাকে খুঁজতে কেন? দাদা কী করেছে?"

বাবা দিদির ওপর রাগত স্বরে বলল, "আমি কী করে জানব? আমাকে বলেছে?"

মা ভয় পেয়ে গেছিল, বলল, "ছেলেটা বাড়িতে এসেছে, এ আবার কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল?"

বাবা বলল, "সেটাই তো বুঝছি না। কী করা যায় বলো তো? বাপ্পাকে বলব?"

মা বলল, "আগে রূপমকে ফোন করি দাঁড়াও।"

বাবা আমাকে বলল, "মিলি, তোর দাদাকে ফোন কর তো।"

আমার হাতে সবসময় ফোন থাকে। কথাটা শোনার পর থেকে আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছিল। কোনওমতে আমি দাদাকে ফোন করলাম। দুটো রিং হতেই দাদা ফোন ধরল, বললাম, "এই দাদা তুই কোথায়?"

দাদা বলল, "এই তো একটু বাজারে এসেছি। কী হল আবার?"

বললাম, "পুলিশ এসেছিল, তোকে খুঁজতে।"

দাদা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "কী বলল?"

মা জোর করে আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বলল, "তুই বাপ্পাকে ফোন কর তো। কী নিয়ে আবার ডাকছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

দাদা কিছু একটা বলে ফোনটা কেটে দিল। মা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "ছেলেটা এত জেদি! আর ভালো লাগে না কিছু আমার!"

৩৭

রূপম ফোনটা রাখার পর শ্রাবন্তী বলল, "কী হল? কে ফোন করেছে?"

রূপম বলল, "বাড়ি থেকে।"

শ্রাবন্তী বলল, "ওহ, কে মিলি?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ।"

শ্রাবন্তী বলল, "কী হয়েছে?"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু না। পুলিশ আমার খোঁজ করছিল।"

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে বলল, "পুলিশ? খোঁজ করছিল? কেন?"

রূপম বলল, "আমি কী জানি? বলেছে বাড়ি ফিরলে থানায় যেতে।"

শ্রাবন্তী খানিকক্ষণ রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী করবে?"

রূপম বলল, "এখনই রওনা দেব। থানায় গিয়ে দেখা করব।"

শ্রাবন্তী বলল, "এত তাড়া?"

রূপম বলল, "আমি না থাকলে সেটা যে আরও সন্দেহের সৃষ্টি করে সেটা বোঝো?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, "যত সব উটকো ঝামেলা সব আমার কপালেই জোটে। যে মেয়েটার কথা আমি কোনওদিন জানতেও পারিনি, কোত্থেকে উড়ে এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে।"

রূপম কয়েক সেকেন্ড শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটা মারা গেছে শ্রাবন্তী।"

শ্রাবন্তী রূপমের চোখে আগুনে চোখ দিয়ে তাকাল। তারপর রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। রূপম স্নান সেরে তৈরি হয়ে বেরোতে যাচ্ছিল এই সময়ে শ্রাবন্তীর মা-র সাথে দেখা হয়ে গেল। বললেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ হঠাৎ?"

রূপম বলল, "বাড়ি যাচ্ছি, একটা আর্জেন্ট কাজ পড়ে গেল।"

শ্রাবন্তীর মা তাকে একপ্রকার জোর করেই খাইয়ে দিলেন। রূপম বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে স্টেশনে পৌঁছোতে হবে।

***

-আপনি ভদ্রমহিলাকে কতদিন ধরে চেনেন?

ওসি মাইতিবাবুর সামনে বসে ছিল রূপম।

প্রশ্নটা শুনে বলল, "অনেকদিন থেকেই। একসাথে পড়তাম আমরা।"

-হুঁ। রিলেশন-টিলেশন ছিল?

-কেন বলুন তো?

-তদন্তের স্বার্থে। জানাটা প্রয়োজন।

রূপম বেশ কিছুক্ষণ মাইতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কি মনে হয়, এটা আমি করেছি?"

মাইতিবাবু রূপমের দিকে তাকালেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, "শুনুন রূপমবাবু, আপনার বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। তবু আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। এই যে আমরা পুলিশে কাজ করি, আমাদের নামে অনেক অভিযোগ আছে, কেউ বলে ঘুষখোর, কেউ বলে চরিত্রহীন, কেউ বলে রাজনৈতিক ছাতা ধরে চলি, কেউ বলে

মেরুদণ্ডহীন... এইসব অভিযোগের অনেক কিছুই সত্যি। কিন্তু একটা কথা বলি, পুলিশের সামনে যখন বসে আছেন, তখন এত অ্যাগ্রেসিভ হবেন না।”

রূপম বলল, “একটা নিরপরাধ লোককে ডেকে জেরা করতে শুরু করেছেন, অ্যাগ্রেসিভ হব না তো কী করব একটু বলবেন?”

মাইতিবাবু বললেন, “আপনি নিরপরাধ সেটা কে ঠিক করবে? আমরাই তো, না?”

রূপম বলল, “এই অঞ্চলে একটার পর একটা রেপ, মার্ডার হয়ে চলেছে, তার প্যাটার্নও এক, আপনার কথা অনুযায়ী আমি চাকরিবাকরি ছেড়ে এসে এসব করে আবার চলে যাচ্ছি?”

মাইতিবাবু হাসলেন, “এরকমও তো হতে পারে রূপমবাবু, আপনি আগের খুনগুলোর প্যাটার্ন দেখে, আপনার বান্ধবীর সঙ্গে পুরোনো কোনও স্কোর সেটল করার জন্য ব্যাপারটা করে মার্কেট গরম করার জন্য সেদিন হম্বিতম্বি করে বেরিয়েছেন?”

রূপম খানিকক্ষণ স্থির চোখে মাইতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনারাও খুব ভালোভাবে জানেন, আমি এখানে ইনভলভড নই, এই অকারণ হ্যারাসমেন্টের কারণটা অনুগ্রহ করে বলবেন?”

মাইতিবাবু বললেন, “ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছিল নাকি আপনার রিলেশনশিপে? আপনি তো বিবাহিত, বউকে লুকিয়ে মেলামেশা করতেন? অনেকরকম প্রোবাবিলিটি আছে জানেন তো? বডির মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে আপনাকে বলে রাখি, কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু পেলে কিন্তু আপনি রেহাই পাবেন না।”

রূপম বলল, "দেখুন, আপনারা যতরকম তদন্ত করার করতে পারেন, কিন্তু রিলেশনশিপ অকারণে টানাহ্যাঁচড়া করবেন না অনুগ্রহ করে। আমার ফ্যামিলির যথেষ্ট সম্মান আছে এই এলাকায়। অকারণ কাদা ছোঁড়াছুড়ি করবেন না আশা করি।"

মাইতিবাবু বললেন, "আপাতত একমাস স্টেশন লিভ করবেন না।"

রূপম চমকাল, "মানেটা কী? আমার অফিস আছে। চাকরি চলে যাবে তো!"

মাইতিবাবু বললেন, "সেটা আপনি বুঝবেন কী করবেন। আপাতত যা বললাম তাই করুন।"

রূপম একটু চুপ থেকে বলল, "বেশ, এবার কি আমি যেতে পারি?"

মাইতিবাবু বললেন, "পারেন। তবে তদন্তের স্বার্থে যে-কোনও সময় ডাকতে হতে পারে।"

রূপম উঠল, বলল, "ডাকবেন, আসব, তবে বৃথা হ্যারাসমেন্ট হলে আমিও কিন্তু ছাড়ব না।"

রূপম বেরিয়ে যাওয়ার পর মাইতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলের তেজ আছে।"

৩৮

"আরে গুরু, তোকে নাকি থানায় ডেকেছিল?"

এক শাগরেদকে নিয়ে বাপ্পা বাইকে করে যাচ্ছিল।

রূপমকে দেখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

রূপম বলল, "হ্যাঁ। ওখান থেকেই আসছি।"

বাপ্পা বলল, "কী বলছে?"

রূপম বলল, "স্টেশন লিভ করা যাবে না। একমাস। নিজেরা ওখানে বসে বসে ছিঁড়বে আর আমাকে স্টেশন লিভ করতে দেবে না।"

বাপ্পা পেছনের ছেলেটাকে বলল, "তুই বেরিয়ে যা। কাজ আছে এখন।"

ছেলেটা বেরিয়ে যেতে বাপ্পা বলল, "তুই বাইকে ওঠ।"

রূপম বলল, "কোথায় যাবি?"

বাপ্পা বলল, "থানায় চ। মাইতিবাবু আমার চেনাজানা। তুই চ।"

রূপম আপত্তি করল, "আরে ছাড় না। আপাতত যা বলছে তাই শুনি। দেখি, তদন্তটা আমাকে ভিক্টিম করেই বা কীভাবে করে।"

বাপ্পা বলল, "তুই অফিস না গিয়ে এখানে পড়ে থাকবি? তোর কথা ভেবেই তো বলছি রে।"

রূপম একটু ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা। চ, দেখি তোর রিকোয়েস্ট শোনে।"

বাপ্পা খুশি হল, "তবে? চ ওঠ।"

রূপম বাপ্পার বাইকে উঠে পড়ল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তারা আবার থানায় প্রবেশ করল।

মাইতিবাবু কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন, রূপমকে বাপ্পার সঙ্গে ঢুকতে দেখে ফোনটা রেখে খানিকটা বাঁকা সুরে বললেন, "কী ব্যাপার রূপমবাবু, আবার পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স করার ইচ্ছা হল নাকি?"

বাপ্পা বলল, "এরকম করে বলছেন কেন স্যার। আমরা ছোটোবেলার বন্ধু। ওর প্রয়োজনে তো আসতে হতেই পারে।"

মাইতিবাবু বললেন, "হ্যাঁ বলুন কী বলবেন?"

বাপ্পা বলল "দেখুন স্যার, ও তো প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, ওর এতদিন ঘরে বসে থাকলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আমি তো ওর গ্যারান্টি নিচ্ছি। ওকে পারমিশন দিয়ে দিন স্যার স্টেশন লিভ করার।"

মাইতিবাবু কয়েক সেকেন্ড বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি জানেন তো আপনি কী বলছেন?"

বাপ্পা বলল, "কেন জানব না? দাদার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব আপনাকে?"

মাইতিবাবু হাসলেন, "বলান। নিন থানার ফোন থেকেই ফোন করুন।"

বাপ্পা একবার রূপমের দিকে তাকিয়ে থানার ফোন থেকে ফোন করল। একটা রিং হতেই ওপাশ থেকে দাদার গলা ভেসে এল, "মাইতিবাবু?"

বাপ্পা বলল, "না দাদা, আমি বাপ্পা বলছি।"

"তুই থানায় কী করতে গেলি আবার? কোনও মাতালকে ধরে নিয়ে গেছে নাকি বড়োবাবু? আমাকে ফোন করছিস কেন তার জন্য? নিজেই বলে দে।"

"না দাদা, ওইজন্য না।"

"তবে?"

"আরে এই রেপ কেসটায় আমার বন্ধুকে বড়োবাবু থানায় ডেকে এনে বলে দিয়েছেন একমাস স্টেশন লিভ করতে পারবে না, নিরীহ নির্বিরোধী ছেলে একটা। প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। ওর তো চাকরিই চলে যাবে। তুমি একটু বলে দাও না।"

"তুই কি গান্ডু?"

বুঝল না বাপ্পা। দাদা হঠাৎ রেগে গেল কেন। বলল, "মানে?"

"মানে বোঝো না? এলাকাটা কয়েক মাস ধরে উত্তপ্ত হয়ে আছে, একটা রেজাল্ট নেই কিছু নেই, সবাই আমাদের উপর খেপে বোম হয়ে আছে, আর তুই বলছিস সাসপেক্টকে ছেড়ে দিতে?"

"সাসপেক্ট? কী বলছ? ও সাসপেক্ট হতে যাবে কেন?"

"তুই কে বাঁড়া? তুই কি গোয়েন্দা গিন্নি? নাকি সিআইডি? বাল সুরকি বালি সাপ্লাই করে আর আমাদের দল করে নিজেকে বড়ো হনু ভেবে ফেলেছিস? পুলিশ কীভাবে তদন্ত করবে তুই ঠিক করে দিবি?"

"মানে দাদা।"

"রাখ শুয়োরের বাচ্চা।"

ফোনটা কেটে গেল। বাপ্পা একবার রূপমের দিকে তাকাল। রূপমের মুখটা থমথমে। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথোপকথনের খানিকটা ও আঁচ করতে পেরেছে। মাইতিবাবু হাসলেন, "কী হল? খুশি কথা বলে?"

বাপ্পা পানসে হাসি দিয়ে বলল, "আসছি স্যার।"

মাইতিবাবু বললেন, “দেখুন রূপমবাবু, অধৈর্য হবেন না। আইনকে আইনের পথে চলতে দিন। আপনি যে এই পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে গেলেন, এটা কিন্তু আপনার এগেইনস্টেই যাবে। আশা করি আপনি খানিকটা বুঝতে পেরেছেন বাপ্পাবাবু?”

রূপম কিছু না বলে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন বাপ্পা।

থানা থেকে বেরিয়ে দুজনেই কোনও কথা বলল না। বাপ্পার বাইকের পিছনে রূপম খানিকটা গিয়ে বলল, “এক কাজ কর, আমাকে মোমের বাড়িতে নামিয়ে দে।”

বাপ্পা বলল, “কেন খামোখা জড়াতে চাইছিস বল তো? বাড়ি যা।”

রূপম ক্লান্ত গলায় বলল, “জড়াতে আর পারলাম কই।”

৩৯ মিলি

আমাদের বাড়িটা একেবারে সাধারণ একটা বাড়ি। অনেক মানুষ থাকে যারা চুরি করে, খুন করে, জেলে যায়, আদালতে যায়। আমাদের বাড়িতে কাউকে যে কোনওদিন থানায় যেতে হতে পারে সেটা আমাদের কারও ধারণাতেই ছিল না।

পুলিশের গাড়িটা চলে যাবার পর পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় করে আমাদের বাড়ি আসা শুরু করল। মজা দেখতেই। মানুষ গুজব ভালোবাসে। অনেকেই উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চেয়েছে দাদা গ্রেফতার হয়েছে নাকি।

দাদা ভালো ছাত্র ছিল, ভালো চাকরি করে। কলকাতার মেয়ে বিয়ে করেছে। পাড়ার অনেকেরই চোখ টাটায় স্বাভাবিকভাবেই। লোকের ভালো দেখতে পায় না কেউ। আমাদের মতো বাড়িতে যে পুলিশ এসেছে সেটা অনেকেরই খুশির কারণ হয়ে গেল।

প্রথমেই এল পাল কাকিমা আর দাস কাকিমা। এসে মা-র কাছে উদ্বিগ্ন গলায়, "ও বউদি, কী হয়েছে গো?"

মার মেজাজ ঠিক ছিল না। তবু যতটা পারে স্বাভাবিকভাবেই বলার চেষ্টা করল, "কই কিছু না তো!"

পাল কাকিমা বলল, "পুলিশ এসেছিল কেন গো?"

মা বলল, "ওই রূপমের সঙ্গে কী একটা দরকার ছিল ওইজন্যই হয়তো।"

মার কথা শুনে দুই কাকিমা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "পুলিশের সাথে আবার রূপমের কী দরকার গো বউদি?"

মা বলল, "আমি কী জানি।"

পাল কাকিমা মাকে বলল, "ওই যে মেয়েটা মরল, ওকে নিয়ে নাকি গো? ওই মেয়েটা তো খুব আসত তোমাদের বাড়িতে। আহা গো, চাঁদপানা চেহারা।"

আমার মাথা গরম হচ্ছিল। মা না থাকলে শিয়োর গালাগালি দিয়ে দিতাম।

দাস কাকিমা গলা নামিয়ে গলাটাকে নাটকীয়ভাবে কাঁদো কাঁদো করে বলল, "মেয়েটাকে রূপমের সঙ্গে বড়ো মানাত গো!"

মা এবার রাগল। বলল, "রূপমের সঙ্গে মানাত না মানাত সেসব কথা এখন বলার কি কোনও দরকার আছে? কেন এসব কথা বলছ এখন?"

দুই কাকিমা চুপ করে গেল। তারা যেতে এল রায় কাকিমা। রায় কাকিমা বরাবরই সব কথাকে রহস্যের মোড়কে বলতে ভালোবাসে। ঘরে ঢুকেই মা-র কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। মা বলল, "কী বলছেন?"

রায় কাকিমা এবার গলার স্বর তুলে বলল, "রূপমকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে?"

মা রেগে গেল এবার, "কীসব অলুক্ষুণে কথা বলছেন দিদি। রূপমকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে কেন? রূপম কি সে ধরনের ছেলে?"

রায় কাকিমা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "সে কী! মিনু যে বলল পুলিশ এসে রূপমকে ধরে নিয়ে চলে গেছে।"

আমি বুঝলাম মার প্রেশার বাড়ছে। বললাম, "না কাকিমা, কোনও ভয় নেই। দাদাকে ধরতে আসেনি। তা ছাড়া দাদা ছিলও না বাড়িতে। এত চিন্তা কোরো না গো, প্রেশার উঠে যাবে, সুগারও ধরতে পারে। তোমার যা চেহারা আরও অনেক কিছুই হতে পারে। ইবোলা, থাইরয়েড, এমনকি ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি-ও হতে পারে।"

রায় কাকিমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “এগুলো কী রে মিলি? রোগ?”

দিদি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল। আমার পেট ফেটে হাসি আসছিল। সেটাকে ম্যানেজ করতে করতে বললাম, “হ্যাঁ কাকিমা, ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি মারাত্মক রোগ। আফ্রিকার গাছেদের থেকে হয়। যাদের নিজেদের থেকে পরের সমস্যায় বেশি চুলকোয় তাদের ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি হয়।”

বলেই হেসে ফেললাম ফিক করে। মা একটা ধমক দিল, “এই মিলি, এগুলো কী ভাষা? বড়োদের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলে বুঝি?”

আমি সড়াৎ করে সরে গেলাম। রায় কাকিমার মুখটা কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছিল আমার কথা শুনে, ভেবে বেশ খানিকক্ষণ হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। দাদা কলকাতা থেকে আসবে ভেবে ভীষণ টেনশন হওয়া শুরু হল। বাবা তখন থেকে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। নিজেই বলল বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। পুলিশ যদি মনে করে অকারণ কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবে তাহলে অনেক কিছু হতে পারে। আজকালকার যা সমাজ তাতে অপরাধী দোষী না নির্দোষ সেটুকু পর্যন্ত কেউ ভেবে দ্যাখে না। সবাই শুধু লোকের গায়ে কাদা ছেটাতে ব্যস্ত।

***

দাদা যখন এল তখন রাত দশটা। বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের ঘরে বসে ছিলাম। দাদার সঙ্গে বাপ্পাদাও এল। ঘরে ঢুকে দাদা বসল ড্রয়িংরুমের টেবিলে। মা বলল, “কী রে, তুই কখন এলি?”

দাদা বলল, “ওই তো, থানায় গেছিলাম। তারপর মোমের বাড়িও।”

বাবা বলল, "থানায় কী বলল?"

দাদা গম্ভীর হল। বাপ্পাদা বলল, "কী বলবে, একমাস স্টেশন লিভ করতে পারবে না। এখানেই থাকতে হবে।"

বাপ্পাদার কথা শুনে মা মুখে আঁচল দিল। বাবা কেমন পাথর পাথর মুখ করে বসে থাকল।

আমার বাবা আর দাদার মুখটা দেখে বুকটা কেমন করে উঠল। ভালোমানুষদের সঙ্গেই কি সবসময় এরকম হতে হয়?

মা বলল, "পুলিশ কি রূপমকে সন্দেহ করছে?"

দাদা রেগে বলল, "থামো না, আমার আর এসব কথা ভালো লাগছে না।"

মা চুপ করে গেল।

বাপ্পাদা বলল, "চিন্তা করবেন না কাকিমা, আমি দেখছি, বুঝতেই পারছেন পলিটিক্যাল অনেক কিছু সমস্যার জন্য নির্দোষ লোকেদের নিয়েও টানাটানি হয়। তবে আমি বেঁচে থাকতে রূপমের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না কেউ।"

বাপ্পাদার কথায় অন্যান্য দিন হাসি পায়। বাপ্পাদা এভাবেই কথা বলে। কিন্তু এ কথাটা শুনে বোঝা গেল বাপ্পাদা ফালতু ফালতু কথাটা বলল না। খুব সিরিয়াস হয়েই কথাটা বলল।

বাপ্পাদা যে দাদাকে কতটা ভালোবাসে এই কথাটা শুনে বুঝতে পারলাম।

কেন জানি না, খানিকটা সাহসও এল।

৪০

“পুলিশ নাকি বিভাসবাবুর ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছিল?”

ভটচাজবাবুর কথাটা শুনে নারাণের কান খাড়া হল। অবশ্য মুখটা নির্বিকার থাকল। সান্যালবাবু ভটচাজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমিও শুনেছি। ছেলেটা তো পড়াশোনায় বেশ ভালো। তা ছাড়া এলাকায় থাকেও না। ওকে খামোখা ফাঁসানো হচ্ছে যা বুঝতে পারছি।”

ভটচাজবাবু বললেন, “কার মনে কী আছে তুমি করে বুঝবে সান্যাল? তুমি জানো কত ছেলে কী থেকে কী হয়ে যায়? সামনে দেখলে বুঝতে পারবে না ভিতরে ভিতরে কী যন্তর চিজ আছে। ওই তো কিছুদিন আগেই পড়লাম না কোন বাঙালির ছেলে আইসিসে যোগ দিয়েছে? কেউ ভাবতেও পেরেছিল? সবকিছু অত সহজ ভাব নাকি হে।”

দাসবাবু ভটচাজের কথাটা শুনে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “কথাটা মন্দ বলোনি। তা ছাড়া...” একটা গলা খাঁকারি দিলেন দাসবাবু।

সান্যাল সহ বাকিরা উদগ্রীব হয়ে দাসবাবুর দিকে তাকালেন, “কী ব্যাপার হে? কী বলতে গিয়ে চেপে যাচ্ছ?”

দাসবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “ও ছেলের সঙ্গে এককালে মেয়েটার সম্পর্ক ছিল হে। কী ছিল মনে আমরা কী জানি?”

সান্যালবাবু জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলেন, “তোমরা কিছুতেই বুঝতে পারছ না। এ খেলা অন্য খেলা। মেয়েটাকে কীভাবে মেরেছে দ্যাখো! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে,

কোনও স্বাভাবিক পাবলিক এসব পারে নাকি? খুব নিম্নমানের জন্তু প্রকৃতির লোকের কাজ। যারা আগের রেপগুলো করেছে এগুলো তাদেরই কাজ।"

একটা হিসাবের খাতা আছে নারানের। সেটায় দোকানের হিসেব লিখছিল। সান্যালবাবুর কথাটা শুনে পেনটায় একটু জোর দিয়ে ফেলল সে। সামান্য কাটাকুটি হল খাতায়।

দাসবাবু বললেন, "জন্তু প্রকৃতির লোক, সে ব্যাপারে তো কোনও সন্দেহ নেই। এ কাজগুলো তো মেইনলি সাইকোরা করে। এদের মাথা খুব ঠান্ডা হয়, প্ল্যানিং করে কাজগুলো করে। তবে কী জানো তো, যেদিন ধরা পড়বে না, গণধোলাই খেয়ে যাবে।"

নারান উদাস চোখে বাজারের দিকে তাকাল। শান্ত স্বাভাবিক বাজার। অন্যান্যদিনের মতোই।

ভটচাজবাবু বললেন, "বিভাসবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে হত। টেনশনে আছেন হয়তো।"

সান্যাল বললেন, "তা যাওয়া যেতেই পারে। বিকেলে যাবে নাকি?"

সবাই মতৈক্যে আসতে বেশি সময় নিলেন না। নারান বোকাসোকা মুখ করে ওঁদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "বিভাসবাবুর ছেলেকে কি ধরেছে পুলিশ?"

সান্যালবাবু মাথা নাড়লেন, "না বোধহয়। তবে এইসব কেসে সাসপেক্টকে চোখে চোখে রাখাটাই নিয়ম।"

নারান যেন খুব বুঝেছে এরকম মাথা নেড়ে মন দিয়ে হিসাব করতে লাগল।

তার যোগের হাত খুব ভালো। ক্যালকুলেটর ছাড়াই সে বড়ো বড়ো যোগ করে দিতে পারে। কালকে অনেক কিছু বিক্রি হয়েছিল, কী একটা পুজো ছিল, সে মন দিয়ে তার হিসেব মেলাতে লাগল।

তিনশো তেত্রিশ আর সাতশো আটাত্তর মেলাতে যাচ্ছিল এমন সময় নজর পড়ল মেয়েটা পড়া থেকে ফিরছে। দূর থেকেই নারান সেই গন্ধটা পেল।

নারানের পেনটা থমকে গেল। কয়েক সেকেন্ড মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সান্যালবাবু বলছিলেন, "আজকাল এমন সময় এসেছে, আত্মীয়স্বজনকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেও লজ্জা লাগে। জায়গাটা কুখ্যাত হয়ে গেল ক-দিনের মধ্যেই।"

দাসবাবু বললেন, "সেই তো, বাপু, রেপ করছিস কর, জামাকাপড়টা তো পরিয়ে দে, ওভাবে সবকিছু ...।"

নারান পরিষ্কার বুঝতে পারল খানিকক্ষণ আগে বড়ো বড়ো কথা বলা দাসবাবুর চোখটা একটু জ্বলে উঠে নিভে গেল।

সে দোকানের ছেলেটাকে বলল, "একটা ছোটো হাতুড়ি কিনে আনিস তো। দোকানের হাতুড়িটা পাচ্ছি না ক-দিন ধরে।"

ছেলেটা বিরক্ত গলায় বলল, "আরও কিছু টাকা দেবেন, পেরেক নিয়ে আসব। ঠাকুরের আসনটা আলগা হয়ে আছে। ঠিক করতে হবে।"

নারান বলল, "আলগা হয়ে গেছে সেটা আগে দেখবি না? যা যা, নিয়ে আয়।"

ক্যাশ থেকে বের করে ছেলেটাকে টাকা দিল নারান।

মেয়েটা একটা দোকান থেকে কিছু একটা কিনছে। নারান খানিকক্ষণ আড়চোখে তাকাল।

তার মাথায় অবশ্য আর-একটা কথাও ঘুরছিল। পুলিশ বিভাসবাবুর ছেলেকে ডেকেছে। তার মানে এখন বিভিন্ন নির্দোষ লোককে কেস দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা থাকবে পুলিশের মধ্যে।

এখন ক-দিন চুপচাপ থাকলে খেলাটা জমে যাবে।

কিন্তু মেয়েটার দিকে চোখ চলে যেতেই তার মনটা বাঁধ মানছে না। নব অঙ্কুরিত শরীরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। মেয়েটার চোখদুটো ডাগর। সবে যৌবন আসছে। গলা টিপে ধরলে চোখদুটো যখন তাকে চিনতে পারবে সেটা ভেবে দোকানের মধ্যে সে অতি কষ্টে মনটা শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

রক্ত জাগতে শুরু করছে আবার।

নিজের ওপরেই বিরক্ত লাগছিল তার। এরকম তো কখনও হয় না। কচি মেয়ের অভিজ্ঞতা তো আগেও হয়েছিল।

তাহলে এর আকর্ষণী শক্তি এত প্রবল মনে হচ্ছে কেন?

৪১

"ঘুমিয়ে পড়েছিস?"

বিভাসবাবু কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পারেনি রূপম। সে শুয়ে শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল। বাবার গলা শুনে উঠে বসল, "না না, এসো।"

বিভাসবাবু ইতস্তত করছিলেন। রূপম লাইট জ্বালাল। বলল, "বসো খাটেই বসো।"

বিভাসবাবু বসলেন, "বউমাকে জানিয়েছিস?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। জানিয়েছি।"

বিভাসবাবু বললেন, "খুব রাগারাগি করছে নাকি?"

রূপম কিছু বলল না। বাড়িতে কিছুই বলা হয়নি এখনও শ্রাবন্তীর ব্যাপারে। বলবে নাকি ভাবছিল।

বিভাসবাবু বললেন, "তুই কলকাতা যেতে পারবি, না তাও পারবি না?"

রূপম বাবার দিকে তাকাল। বাবার বয়স হচ্ছে। অথচ এই বাবাই তাকে নিয়ে একসময় কত ঘুরত সাইকেলে করে। সময় কীভাবে কেটে যায়। দূরত্ব তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে। সে বলল, "থানায় কথা বলতে হবে। দেখি। ও যদি আসতে চায় তাহলে নিয়ে আসব।"

বিভাসবাবু বললেন, "বউমা যা চায় তাই কর। এখানে কমফর্টেবল নাও হতে পারে।"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। সেটা ভেবেছি।"

বিভাসবাবু বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। পুলিশ নিরপরাধকে অপরাধী করে দেয়। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে পলিটিক্যাল কারণে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে তোকে। তোর মা আমাকে বলছিল পলিটিক্যাল লোকজনদের কাছে যেতে, আমি বারণ করেছি। সৎ

লোকেদের কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তুই দেখিস। ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না।"

রূপম কিছু বলল না। আজ কি তার বা মোমের এই অবস্থার জন্য বাবাকে দায়ী করা যায়? কোনওভাবেই না। বাবা মা-রা কখনও খারাপ চাইতে পারে না। আজ যেটুকু সে হতে পেরেছে বাবার জন্যই তো! তখন মোমের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ালে কি সে এই জায়গায় যেতে পারত? তারও তো সন্তান আসছে। বাবার মতন বাবা কি সে হতে পারবে? একসময় কত কষ্ট করেছে তারা, অথচ শত কষ্টেও বাড়ির সবথেকে ভালো জামাটা তার জন্য নিয়ে এসেছে বাবা।

বিভাসবাবু বললেন, "অফিসে জানিয়েছিস?"

রূপম বলল, "না। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না কী বলব।"

বিভাসবাবু বললেন, "জানিয়ে দে। কোনও কিছু ঢাকতে হবে না। মিথ্যা কথা বা অর্ধসত্য বলার দরকার নেই।"

রূপম বলল, "ওরা দোষী প্রমাণিত করলে আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে বাবা। তখন আমরা কী খাব? দুটো বোনের বিয়ে বাকি আছে এখনও।"

বিভাসবাবু বললেন, "এই কথাগুলো তোর মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন? তোর মনে আছে ক্লাস টেনে যখন পড়তি তখন টেস্টে স্কুলের বাগচীবাবুর কাছে প্রাইভেট টিউশন নিতি না বলে ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন? আমারও ধারণা হয়ে গিয়েছিল তুই বোধহয় মাধ্যমিক ফেল করে যাবি। সেই টেস্টের সেকেন্ড লিস্টে তুই পাশ করেছিলি। আর মাধ্যমিকে এলাকার মধ্যে সবথেকে বেশি নাম্বার পেয়েছিলি। ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়তি তোকে কত হাতখরচা দিতে পারতাম আমি? নিজেই তো পড়েছিস। টিউশনি করেছিস, স্কলারশিপ

পেয়েছিস, সব নিজের জেদে। এত কিছুর একটা লড়াই, সামান্য একটা পলিটিক্যাল কন্সপিরেসিতে শেষ হয়ে যায় নাকি? ভাবলি কী করে?”

রূপম বাবার দিকে তাকাল। বাবা সব মনে রেখেছে। তাকে নিয়ে বাবার সবথেকে বেশি গর্ব। সে অনেকক্ষণ পরে হাসল। তারপর বলল, “চাকরি চলে গেলে কী করব এই রেজাল্ট দিয়ে সেটা তো বলো!”

বিভাসবাবু বললেন, “তুই আরও চাকরি পাবি। নইলে দেখা যাবে। তোর বয়স কত? এই বয়সে এত চিন্তা করতে হবে না। কষ্ট করে সৎভাবে যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাদের কিচ্ছু হয় না। এই লড়াইটা তো তোর একার না, আমাদের গোটা পরিবারের, টিকে থাকার লড়াই। অনেক রাত হল। তুই ঘুমিয়ে পড় এবার।”

বিভাসবাবু হঠাৎ করে কথাটা শেষ করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন। রূপম একটু অবাক হল। বাবা কেমন চুপচাপ থাকে অন্যান্য সময়। এখন হঠাৎ করে এত স্পষ্টবক্তা হয়ে তাকে এভাবে আশ্বাস দিয়ে গেল!

সময় মানুষকে কখনও ভেঙে দেয়, কখনও শক্ত করে তোলে। বাবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হয়েছে।

ভালো লাগছিল রূপমের। এখনই ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি তাহলে!

***

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে ভেবে যখন ঘুম চলে আসছিল তখনই জানলায় ঠকঠক শব্দ হতে শুরু করল। সে অবাক হল। রাত সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। এত রাতে জানলায় নক করছে কে? প্রথমে ভাবল বাড়ির সবাইকে ডাকবে। তারপর মনে হল পরিচিত কেউ এসেছে।

সে গলার আওয়াজ যতটা সম্ভব কম করে বলল, "কে ওখানে?"

জানলার ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, "ছাদে আসুন, কথা আছে।"

রূপম অবাক হল। গলার স্বর অপরিচিত। সে বলল, "আপনি কীভাবে আসবেন?"

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, "আহ, আপনি আসুন না। তারপর দেখবেন নাহয়।"

রূপম বেরোল ঘর থেকে। ছাদে যাওয়ার সিঁড়িতে নিচে তালা নেই। উপরে ছিটকিনি দেওয়া। রূপসী আর মিলিরা জেগে আছে।

সে ধীর পায়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠল। ছিটকিনি খুলে দেখল পাগলটা দাঁড়িয়ে আছে।

৪২

-সিগারেট আছে মশাই?

পাগলটার কথা শুনে চমকাল রূপম। এ তো রীতিমতো সুস্থ মানুষের গলা!

সে বলল, "আপনি...?"

"পাগল না মশাই, আইবি-র লোক। তবে বেশিদিন এই ভূমিকায় থাকতে থাকতে ওই ধারেকাছেই চলে গেছি বলতে পারেন।"

রূপম বলল, "ওহ। আমার কাছে তো এখন সিগারেট নেই।"

পাগলটা বিরক্তির ভাব করল।

রূপম বলল, "পাগল সেজে ঘুরছেন কেন? ইনভেস্টিগেশনের কাজ?"

পাগলটা বলল, "আর কী হতে পারে? যেমন জায়গা আপনাদের! আমার মতো ঘুঘু লোকেরও জিনা হারাম করে দিচ্ছে মশাই! একই পদ্ধতিতে খুন আর রেপ করে চলে যাচ্ছে অথচ কেউ ধরতেও পারছে না!"

"পারছে তো, আপনাদের পুলিশ পারছে, আমার স্টেশন লিভ একমাস পিছিয়ে দিল সাফল্যের সঙ্গে।" তিক্ত গলায় বলল রূপম।

পাগলটা খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে বলল, "ওটা তো আমিই বলে করিয়েছি।"

রূপম অবাক হল, "মানে?"

পাগলটা ছাদের উপরেই বসে পড়ল, "সীমান্তে সৈনিকরা গুলি খেয়ে মরছে আর আপনি দেশের জন্য এইটুকু করতে পারবেন না মশাই? একটা মারাত্মক খুনি, সাইকো দ্য রেপিস্ট বুক বাজিয়ে সমাজের বুকে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরতে হবে না?

আপনাকে আটকানো হয়েছে শুনে সে তো দিব্যি খুশি হয়ে গেছে এতক্ষণে। পরের টার্গেটও ঠিক করে নিয়েছে নির্ঘাত। এইটুকু স্পেস তো তাকে দিতেই হত। আপনি সেটা দিলেন নিজে শহিদ হয়ে। ভয় পাবেন না। পরে আপনার যা যা ডকুমেন্ট লাগবে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি সাপ্লাই দিয়ে দেব।"

রূপমও বসল। খানিকক্ষণ চুপ করে বলল, "তা আপনি এখন কেন এলেন?"

পাগলটা বলল, "এই যে খ্যাপাচোদার মতো আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটা উলটে আমাদের ইনভেস্টিগেশনেই প্রবলেম করে দিতে পারে সেটা বুঝছেন না বলে একান্ত নিরুপায় হয়ে আপনাকে দর্শন দিতে আসতে হল। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন।"

রূপম বলল, "আমি তো এমন কিছু বিহেভিয়ার করিনি যাতে আপনাদের এটা মনে হতে পারে!"

পাগলটা বলল, "করেছেন। আপনি আপনার রাজনীতি করা আর-এক গান্ডু বন্ধুকে নিয়ে দ্বিতীয়বার থানায় গেছেন। থানার বড়োবাবুকে তো আর আমি বলিনি, অন্যভাবে বলানো হয়েছে। তার আলাদা সেটিং করতে হয়েছে। আপনার বন্ধু তার রাজনৈতিক দাদাকে ফোন করেছে। কপাল ভালো তিনি খিস্তি মেরে দিয়েছেন আপনার বন্ধুকে। নইলে আর-এক কেলোর কীর্তি হত।"

রূপম বলল, "ওই নেতা আপনাদের নেটওয়ার্কে নেই?"

"খেপেছেন আপনি? উনি থাকলে আর দেখতে হত না। ইনভেস্টিগেশন গাধার ইয়েতে ঢুকে যেত। ওনাকে শুধু আরও ওপর থেকে হালকা টাচ করে রাখা আছে এই এলাকায় যাকেই ঢোকানো হবে তাকে যেন ছাড়ানোর জন্য কেউ থানায় না যায়। উনি সেটা শুনেছেন সেটা আমার বাপের ভাগ্য ভালো।"

রূপম বলল, “তাহলে আমি এখন এই একমাস এখানেই বসে থাকব বলছেন?”

পাগলটা রূপমের কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ঝুলি খুঁজতে শুরু করল। একটু পর একটা ঠোঙা বের করে বলল, “ইউরেকা।” তারপর তার থেকে একটা আধখাওয়া মুরগির ঠ্যাং বের করে চিবোতে চিবোতে বলল, “থাকবেন। কী সমস্যা? বাড়িতে থাকবেন, বাপ-মা-বোনদের সাথে বন্ডিং শক্ত করবেন। আজকাল তো বাঙালি ফ্যামিলি নিয়ে থাকা ভুলে গেছে। আপনিও তো বউ নিয়ে আলাদা থাকবেন। এখন থাকুন, ভালো থাকবেন।”

রূপম খানিকক্ষণ পাগলটার ঠ্যাং চিবোনো দেখে বলল, “এটা আপনি খেতে পারছেন?”

পাগলটা বলল, “কেন? খেতে পারব না কেন?”

রূপম বলল, “এটা খেলে তো কলেরা, আমাশা, জন্ডিস সব হতে পারে!”

রাস্তার ভেপারের আলো পাগলটার চুলের ওপর পড়ে একটা হলুদ আভা তৈরি করছিল। পাগলটা ঠ্যাংটা ঠোঙায় রেখে রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমাদের দেশে কত শতাংশ মানুষ পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে এ সম্পর্কে ডু ইউ হ্যাভ এনি ফাকিং আইডিয়া? কত শতাংশ শিশু রাস্তায় ফুটপাথে শুয়ে থেকে প্রতি রাতে হারিয়ে যায় আপনি জানেন? কোনওদিন সুযোগ পেলে আমি আপনাকে দেখাব। আমি কেন তবে তাদের মতো জীবন কাটাতে পারব না বলতে পারেন?”

রূপম বলল, “আপনার নাম জানতে পারি?”

পাগলটা বলল, “ডিপার্টমেন্টে সবাই গোকুল বলে ডাকে। আপনিও ওই নামটা ধরে আমাকে ডাকতে পারেন। তবে না ডাকাই ভালো। আমার কথা নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না।”

রূপম বলল, “তা বলব না। তবে আপনার আসল নামটা কী?”

পাগলটা বলল, “বাপের দেওয়া নাম, দাঁড়ান মনে করি।”

তারপর বেশ খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে বলল, “ভুলে গেছি মশাই। মনে পড়ছে না। আচ্ছা। আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। আমিও জায়গায় যাই। গুডনাইট।”

বলে পাগলটা রূপমের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছাদ থেকে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেল। রূপম বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

৪৩

মধুমিতার একটা বয়ফ্রেন্ড হয়েছে।

তাও ফেসবুকে।

পড়া থেকে বেরিয়েই ফোন কানে দিয়ে "সোনু, জানু" করে ন্যাকামি করে আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

প্রথম প্রথম মজা পাচ্ছিলাম, এখন বিরক্তি ধরে গেছে।

ধরাটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ করে গলার টোন চেঞ্জ করে অনেকদিনের চেনা বন্ধু কাউকে যদি ফোন করে বলে "জানু আই অ্যাম মিসিং ইউ" তাহলে বিরক্তি ধরাটাই স্বাভাবিক।

ছেলেটা দিনে একটা করে ফটো আপলোড করে আর দুনিয়াসুদ্ধ মেয়েকে ট্যাগ করে।

সে নাকি মধুমিতার বয়ফ্রেন্ড।

কাল পড়া থেকে ফিরছি, আর মধুমিতা যথারীতি ফোনে ন্যাকামি সেরে আমায় গর্ব গর্ব গলা করে বলেছে, "জানিস ও যে জিমটায় যায় সেটায় দেবও আসে জিম করতে।"

আমি একটা আইসক্রিম খাচ্ছিলাম।

ওর কথায় বিষম-টিষম খেয়ে অস্থির হয়ে গেছি। আর আমার হাসি দেখে ওর কী রাগ! বলে, "তুই হিংসা করছিস এখন। নিজের তো কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই, তাই আমাকে হ্যাটা দিচ্ছিস, আমি বুঝি না ভেবেছিস?"

আমি তাতে আরও হাসা শুরু করি। আর ও আরও রাগে।

ছেলেটা ওকে বলেছে ও নাকি একটা কী হারলে ডেভিসন কোম্পানির একটা বাইক পনেরো লাখ টাকা দিয়ে কিনবে। আমি সেটা শুনে বলেছি বাইকটা মাটিতে চলবে তো রে? নাকি আকাশেও চলবে?

শুনে আরও রেগেছে।

আমি একবার ছেলেটার প্রোফাইল দেখেছি। কেমন পান্তাভাত পঞ্চু মার্কা চেহারা। বোঝাই যাচ্ছে মধুমিতাকে ভাট মারছে। আর ও সেটাকে খেয়ে যাচ্ছে।

আমি দেখেছি এটাই হয়। ভাট কেসগুলোর কপালে ভাট কেসগুলোই জোটে। কয়েকটা এক্সসেপশন থাকে, যেমন অয়নদার সাথে যদি আমার...

এই যে, আবার অয়নদার লাইনে চলে যাচ্ছি।

আগে মধুমিতার কথা বলে নি।

মধুমিতার খুব ইচ্ছা একদিন কলকাতা গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে। আমি ওকে বলেছি তুই কেন কলকাতা যাবি। ছেলেটা যদি তোকে সত্যিকারের ভালোবাসে তাহলে ছেলেটাকেই এখানে আসতে বল। তাতে মধুমিতা আমাকে কটমট করে দেখে বলেছে, "যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে একদম কথা বলবি না। তুই জানিস ও কত ব্যস্ত একজন ছেলে? ইচ্ছা করলে বাইক নিয়েই ও চলে আসতে পারে। কিন্তু এখন ওর জিম আছে, ডান্স আছে। ও কিছুতেই আসবে না।"

আমি অবাক হয়ে বলেছি, "ও ডান্সও করে?"

মধুমিতা গম্ভীর হয়ে বলল, "করে তো। ও খুব ভালো পাগলু ডান্স নাচতে পারে। দেখবি একটা ভিডিয়ো আপলোড করেছিল। আমার তো দেবের থেকেও ওর পাগলু ডান্স বেশি ভালো লাগে।"

শুনে আমি হাসব না কাঁদব কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, "তুইও শিখে নে। বিয়ের পর বর বউ লে পাগলু ডান্স ডান্স ডান্স ডান্স বলে নাচতে থাকবি।"

মধুমিতা বলল, "তুই কি ইয়ার্কি মারছিস আমার সাথে?"

আমি সিরিয়াস মুখ করে বললাম, "ইয়ার্কি মারব কেন? এতে ইয়ার্কি মারার কী আছে? তুইও তো নাচ জানিস। জানিস না?"

মধুমিতা আমার সিরিয়াস মুখ দেখে সিরিয়াস হয়ে বলল, "আরে আমাদের স্যার পাগলু শেখায় না। সেই শ্যামলসুন্দর পাঁচ বছর ধরে শিখিয়ে যাচ্ছে। ওই পাড়ার টিঙ্কুদা আছে, টলিউড আর বলিউড শেখায়। আমি ঠিক করেছি বাবাকে বলে ওখানে শিখতে যাব। এইসব রবীন্দ্রনৃত্য আজকাল চলে বল? ওকে যখন বলেছি তখন কী হাসি, জানিস? বলে ওইসব ওল্ড হয়ে গেছে।"

আমি বড়ো বড়ো চোখ করে বললাম, "তাই? রবীন্দ্রনৃত্য ওল্ড হয়ে গেছে বলেছে?"

মধুমিতা জোর পেয়ে বলল, "বলেছে তো! এখন তো এসবেরই যুগ বল?"

আমি অনেক কষ্টে জিভ কামড়ে হাসি সামলাতে সামলাতে বললাম, "হ্যাঁ তো। স্টেজের একদিক থেকে তুই দৌড়ে আসবি আর একদিক থেকে তোর পঞ্চু হিরো দৌড়ে এসে পাগলু ডান্স ডান্স ডান্স করবে, জমে যাবে কিন্তু, তুই এখনই ভরতি হ।"

এইটুকু বলে আর পারলাম না। হিহি করে হেসে দিলাম। তারপর থেকে মধুমিতা আমার উপর হেবি খচে আছে। দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। পড়ার পরে ছুতোনাতায় একা একা বেরিয়ে যায় আমাকে না নিয়েই।

বাড়ির গল্প আবার আরও সরেস। বউদি ফিরেছে।

সবাই দুপুরে ঘুমোচ্ছিলাম।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলে দেখি বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে বললাম, “তুমি?”

বউদি আমার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বলল, “কেন আসতে বারণ নাকি? তোমার দাদা কোথায়?”

আমি বললাম, “ঘরে।”

বউদি গটগট করে ঢুকে ওদের ঘরের দরজায় নক করল। দাদা দরজা খুলে দেখল বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

আমার হেবি হাসি পাচ্ছিল। দাদার মুখটা বউদিকে দেখে কেমন পেটো পাঁচুর মতো হয়ে গেল।

বেচারা ভালোই ছিল বাড়িতে।

বউদি যে বিনা নোটিসে চলে আসবে বুঝতে পারেনি।

দাদা বলল, “তুমি?”

বউদি বলল, “সবাই মিলে তুমি তুমি করছ কেন? হ্যাঁ আমি। এলাম।”

দাদা বলল, “তুমি একা একা চলে এলে?”

বউদি বলল, “কেন একা আসতে পারি না?”

দাদা বলল, “জানাতে পারতে তো একবার।”

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “মিলি, যা খাবার আছে বের করে দাও তো। আমার দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি।”

দাদা কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা মুখ করে বউদির দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি হাসি চাপতে চাপতে ফ্রিজের দিকে ছুটলাম।

দুপুরে চারাপোনা হয়েছিল।

বউদি আবার ছোটোমাছ খেতে পারে না।

৪৪

শিয়ালদা স্টেশনে নারান যখন নামল তখন দুপুর বারোটা। দোকানের মাল নিতে প্রতি মাসেই কলকাতা আসতে হয়। অন্যান্যবার দোকানের ছেলেটাকেই পাঠায়, শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেই আসে। ছেলেটাও খুশি হয়। অনেক মাল বইতে হয়। নারান গেলে ট্রান্সপোর্টে নিয়ে আসে। ছেলেটা গেলে ওর ঘাড় দিয়েই সব যায়।

বিপিনের হোলসেলারের ব্যবসা বড়োবাজারে। নারান যেতেই বিপিন খুব খুশি হল। নারানের মতো শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবের লোককে বিপিন বড়ো পছন্দ করে। নিজেই বলে সারাক্ষণ খিট খিট করতে করতে আর দাম নিয়ে ঝগড়া করতে করতে জীবন চলে গেল। নারানের সঙ্গে কথা বলে তার মাথা ঠান্ডা হয়।

"বসো বসো, শরবত খাবে তো?" দোকানের একটা ছেলে চেয়ার এগিয়ে দিল।

নারান বসল।

বিপিন বলল, "কী খবর তোমাদের ওদিকে? প্রায়ই তো খবরে দেখাচ্ছে কীসব রেপ-টেপ হচ্ছে? খুব বাজে অবস্থা তো!"

নারান বলল, "হ্যাঁ খুব বাজে অবস্থাই বটে।"

"পুলিশ কী করছে? কাউকে ধরতে পারল?"

নারান না-সূচক মাথা নাড়ল।

বিপিন বলল, "এখন চারদিকে এই একই অবস্থা চলছে। তুমি দেখবে, নিশ্চয়ই কোনও কমবয়সি ছোঁড়াদের কাজ। এই মোবাইল হল যত অনিষ্টের মূল। হাতে হাতে মোবাইল। সবাই ব্লু-ফিল্ম দেখে, আর এইসব করে বেড়ায়।"

নারান কথাটা শুনে মৃদু হেসে বলল, "তা যা বলেছ। এই বাজারে ছেলেমেয়ে হওয়াও চিন্তার কারণ।"

বিপিন চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "আমার বড়ো ছেলে। বিয়ে-থা দিয়েছি, থাক আনন্দে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে, তা না। ওই নেশা ধরে গেছে। ব্যবসা আলাদা করেও শান্তি নেই বুঝেছ? সব টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে মাগিবাজি করে। যুগের ধর্ম বুঝলে কি না? ছোটোটার আবার ব্যবসা পছন্দ না। পার্টি মিছিল মিটিং করে বেড়ায়। আমার হয়েছে জ্বালা। ভগবান দুটো ছেলে দিয়েছে তারা যদি এরকম হয় তবে কেমন লাগে বলো দিকি? বউটা আবার বড়ো ছেলেকে কিছু বললেই তেড়ে আসবে। পুরুষমানুষ নাকি! তা বাপু পুরুষমানুষ বলে কোথায় লেখা আছে খারাপ পাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে শুয়ে থাকবে।"

নারান বলল, "এটা নিয়ে তো তুমি অভিযোগ করতে পারো না। এসব রোগ তো চিরকালই ছিল।"

বিপিন নারানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "তা জানি, আদিম রোগ, তা বলে আমার ঘরেই হতে হল? এর থেকে টাকাপয়সা থাকত না, বেঁচে যেতুম। তবু ভালো এখনও অবধি মেয়েছেলে নিয়ে বাড়িতে এসে ওঠেনি। শেষ বয়সটা নিয়ে বড়ো চিন্তা হয়ে গেল হে।"

নারান বলল, "চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা তোমার পেমেন্ট কত বাকি আছে একটু হিসাব করে বলবে? আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা এনেছি আজকে।"

বিপিন খুশি হল। টাকার গন্ধ তার বড়ো প্রিয়। সে ক্যাশিয়ার চট্টরাজকে নির্দেশ দিল নারানের হিসেব বের করে দিতে।

তারপর বলল, "অবশ্য এককালে ইয়ের নেশা আমার যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। তবে খারাপ পাড়ায় যেতে হয়নি কোনওদিন।"

নারান অবাক হল, "তাহলে?"

বিপিন বলল, "ছিল ছিল। সে অনেক কেচ্ছা। তা ছাড়া এখানে বলাও যাবে না। তোমার মতো ভদ্রলোকেদের অবিশ্যি এসব কথা কানে শোনাও পাপ।"

নারান হাসল, "তা বটে। সে সাহসই করে উঠতে পারলাম না সারাজীবনে। নিজের বউকেই..."

বিপিন গলা খাঁকরাল, আর-এক কাস্টমার এসে গেছিল। নারান উঠে বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি।"

বিপিন অবাক হল, "কোথায় যাবে?"

নারান বলল, "আসছি, হিসাবটা চট্টরাজবাবু করে নিন, আমি এসে টাকা মিটিয়ে দেব।"

বিপিন বলল, "আচ্ছা ঘুরে আস।"

নারান বেরোল। অনেকরকম দোকান বড়োবাজারে। সে একটা ইমিটেশনের দোকানে গিয়ে বউয়ের জন্য চুড়ি কিনল। দোকান থেকে টাকা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ তার মনে হল সবকিছু করার পরে মৃত নগ্ন শরীরটাতে যদি গয়না পরানো যায় কেমন হবে? ভিড় বাজারের মধ্যেই ছবিটা কল্পনা করল সে চোখ বন্ধ করে। উত্তেজনাটা ফিরে আসছে।

কলকাতাকে সে ভয় পায়। এত লোক, এই ভিড়ে থাকলে কি তার ইচ্ছা পূর্ণতা পেত? ইমিটেশনের দোকানে ফিরে গেল সে। পছন্দ করে গয়না কিনল কয়েকটা। গয়নাগুলো রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল, হাতুড়ি কিনতে হবে একটা। হাতুড়ির কথা তার মনে ছিল না কেন?

বিপিন দোকানেই ছিল। দোকান ফাঁকা। নারানের হাতে ব্যাগগুলো দেখে বিপিন বলল, "কী কিনলে হে?"

নারান মাথা চুলকে বলল, "এই ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস।"

বিপিন বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। আমি তোমার কথা ভাবি মাঝে মাঝে। নিরীহ নির্ভেজাল লোক। কোনও দোষ নেই, নেশা নেই, আচ্ছা থাকো কী করে বলো তো?"

নারান অমায়িক হাসি হাসল, "ওই চলে যায় আর কি।"

বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সবাই যদি তোমার মতো হতে পারত। আজকাল ভালো লোকের বড়ো অভাব।"

নারান হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকল।

৪৫

পাড়ার ক্লাবে ক্যারাম খেলা হচ্ছিল। রূপম খেলছিল।

বাপ্পা এসে ডাকল সিরিয়াস মুখে, "গুরু, এদিকে শুনে যা।"

রূপম বেরোল। ক্লাবের বাইরে একটা ছাতিমগাছের তলায় বেঞ্চি আছে। তারা সেখানে গিয়ে বসল। বাপ্পা বলল, "থানায় গেছিলাম।"

রূপম বলল, "কী করতে?"

বাপ্পা বলল, "এই একটু খোঁজখবর নিতে। তোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।"

রূপম বলল, "কী বলল?"

বাপ্পা বলল, "বড়োবাবু মুডে ছিলেন আজ। বলে দিলেন একমাস পরে স্টেশন লিভ করতে পারবি। নো প্রবলেম।"

রূপম বলল, "এখন করতেই বা কী সমস্যা?"

বাপ্পা বলল, "সে কীসব আছে, আমি অত বুঝি না। একটু কষ্ট করে থেকেই যা, কী করবি।"

রূপম মনে মনে হাসল। মুখে বলল, "যাক। অনেকটা করলি আমার জন্য। থ্যাংকস।"

বাপ্পা বলল, "কী করলাম বল? তোর চাকরি নিয়ে সমস্যা না হয়। একমাস থাকা মানে অনেকটা।"

রূপম বাপ্পার দিকে তাকাল। রাজনীতি, স্বার্থপরতা, সবকিছুর পরেও মানুষের মধ্যে এখনও মানুষের কথা ভাবার জন্য একটা মন আছে তাহলে? সে বলল, "তুই চিন্তা

করিস না। কিছু একটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। অনেকদিন পরে মনে হল তুই খুব একটা চেঞ্জ হোসনি। সেই আগের মতোই আছিস।"

বাপ্পা বলল, "দেখ ভাই, বেঁচে থাকার জন্য যেরকম যেরকম করতে হয় সেরকমটাই করি। তোর মতো তো আর ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলাম না। চাকরি করে খাবার ক্ষমতা আমার কোনও কালেই ছিল না সেটা আমার থেকে ভালো আর কে জানবে! এবার এসবের জন্য কারও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস কর, কারও ক্ষতি হোক চাই না কোনওদিন। কী করব, আমাদের সমাজটাই এরকম হয়ে গেছে। টাকা ছাড়া এখন একটা পাতাও নড়ে না। তুই বেঁচে গেছিস এসবের থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিস।"

রূপম বলল, "স্বাভাবিক, মানুষ তো পরিবর্তিত হয় সমাজের চাহিদা মেনেই। যেমন সমাজ, মানুষ তেমনই হবে। তুই অত ভাবিস না, শুধু দেখিস, কোনও নিরীহ মানুষের যেন কোনওদিন ক্ষতি না হয়।"

বাপ্পা হাসল, "গুরু এটা একটু বেশি হেবি কথা বলে দিলে তুমি। আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম না, কী যেন ইংরেজিটা?"

রূপম বলল, "সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট?"

বাপ্পা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা নিরীহ লোক না খেলে কী করে হবে গুরু?"

রূপম বলল, "বেঁচে থাকার জন্য লড়াইটা কি চিরকালই হবে নাকি? একটা কোথাও গিয়ে তো আমরা থিতু হব নাকি? ধর না দেশভাগের সময়টা। কত লোক ওপার থেকে এপারে চলে এলেন। সেসময়টা তো স্ট্রাগল ছিলই। স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স যাকে বলে। কিন্তু ধীরে ধীরে কলোনি হল, তার বাসস্থানের সুরাহা হল, জল এল, ইলেক্ট্রিসিটি

এল, যে মানুষটা খেতে পেত না সে খেতে পেল। ধীরে ধীরে একটা স্থিতাবস্থা এল। এরপর তো স্বাভাবিকভাবেই লড়াই করার ব্যাপারটা কমে এল। কিন্তু এখন যে সময়টা এসেছে সেটা অন্য সময়। আমরা নিজেরাই এই স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করে দিতে শুরু করেছি। যে কারণেই আবার স্ট্রাগলের কথাটা আসছে। আজ দেখ না, স্বাধীনতার এত বছর পরেও তোকে চিন্তা করতে হচ্ছে কোন টেন্ডারটা পাবার জন্য তোকে কোন কোন জায়গায় খুশি রাখতে হবে। আমাকে একটা অন্যায় কেসে ফাঁসিয়েছে বলে সেই তোকেই তো অন্য রূপে দেখলাম। আমরা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি এক্সপ্লয়েট করে ফেললাম বোধহয়।"

বাপ্পা খানিকক্ষণ রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুরু অনেকদিন পরে তোর সাথে কথা বলে ভালো লাগল। তুই তো কোনওদিনও আর পাঁচটা ভালো ছেলের মতো আমাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতিস না। তুই আমাদের সঙ্গে চিরকালই মিশেছিস। কাকিমা কাকাবাবুরাও কোনওদিন বারণ করেননি আমাদের সঙ্গে মিশতে। ভালো লাগে তোর সঙ্গে কথা বলতে। তুই পালটে যাস না কিন্তু কোনওদিন।"

রূপম হেসে ফেলল, "আর পালটাব কবে? যা-তা বলছিস তো। আচ্ছা শোন আমি বাড়ি যাই এবার। রাতে আসব, আড্ডা হবে।"

বাপ্পা গলা নামিয়ে বলল, "গুরু বিয়ার খাবে নাকি?"

রূপম বলল, "না, সেই তো বাড়িতে ফিরতে হবে। বাড়িটা এখনও আমার কাছে একটু আলাদা জায়গা রে। বাবা তো। যতদিন বেঁচে আছে, সম্মানটা প্রাপ্য লোকটার, তাই না?"

বাপ্পা বলল, "উফ গুরু, সেন্টু দিয়ে দিচ্ছ পুরো। আচ্ছা, যা, বিকেলে আসিস নাহয়।"

***

রূপম বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে একটা ধাক্কা খেল। বেশ খানিকক্ষণ মনে হল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

শ্রাবন্তী রান্নাঘরে মার কাছে চাপ নিয়ে রান্না শিখছে। মিলি আর রূপসীও আছে।

৪৬

একটা নর্দমার পাশে মোমের নগ্ন শরীরটা পড়ে আছে। শরীর থেকে রক্ত ভেসে নর্দমায় পড়ছে।

মোমের মুখের কাছে ভনভন করছে মশা।

অজস্র লাল পিঁপড়ে শরীর জুড়ে একটু একটু করে বাসা বাধছে। একটা সময় ধীরে ধীরে মোম উঠে দাঁড়াল। তারপর শহরে হাঁটতে বেরোল। শহরের সব লোক মোমের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মোমের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্চিন্তে সে হেঁটে চলেছে রাস্তা জুড়ে। একটা সময় মোম রূপমের সামনে এসে দাঁড়াল। রূপমকে বলল, "ভালো আছ?"

রূপম কী বলবে বুঝতে পারছে না, মোমের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। আবার মাথা নীচু করলে চোখ চলে যাচ্ছে মোমের নগ্ন শরীরের দিকে। রূপম কথা বলতে চাইছে, বলতে পারছে না, তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছে...

রূপম ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘড়িটা নাইটবাল্বের পাশেই। দেখল রাত আড়াইটা বাজে। পাশে শ্রাবন্তী ঘুমোচ্ছে। সে খানিকক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে রইল। দিনে ভুলে গেলেও স্বপ্নে অবধারিতভাবে মোম চলে আসছে।

সে খাট থেকে নামল। টেবিলে বোতল রাখা আছে। বেশ খানিকটা জল খেয়ে সোফায় বসল।

মিনিট দশেক পর উঠে দরজা খুলে ছাদে গেল। গোটা পাড়া ঘুমোচ্ছে।

গোকুলবাবুও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

রূপম বেশ খানিকক্ষণ গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা এভাবে থাকে কী করে? অবশ্য কাশ্মীরে সে দেখেছে সেনারা মাঠেঘাটেই সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে ডিউটি করেই এঁরা অভ্যস্ত।

মোবাইলটা নিয়ে এসেছিল সে। অনেকদিন পরে হোয়াটসঅ্যাপ খুলল। অফিসের বিভিন্ন কলিগ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইছে সব ঠিক আছে কি না। রূপম সবাইকে নিশ্চিন্ত করল। ছাদে হাওয়া দিচ্ছে খুব হালকা। রূপম ছাদের মেঝেতেই চুপচাপ বসে রইল। পাড়াটা দিন দিন কেমন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ির সামনে আগে মাঠ ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে। পাড়ায় কোথাও খালি জমি পড়ে নেই। এই মফস্সলেই জমির দাম হুহু করে বাড়ছে। মানুষের সব জায়গাতেই বাড়ি করতে হবে। গাছ কাটা হচ্ছে। মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়ছে।

রূপম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোটোবেলাটাই ভালো ছিল। এত কিছু মাথায় আসত না তখন। আজকাল ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো কেমন উত্তেজিত করে দিচ্ছে।

"কতদিনের রিলেশন ছিলে মেয়েটির সঙ্গে আপনার?"

রূপম চমকে তাকাল। গোকুলবাবু কখন নিঃশব্দে ছাদে চলে এসেছেন।

সে বলল, "আপনি তো খুব সুইফট।"

গোকুলবাবু একটু দূরত্ব রেখে বসলেন। বললেন, "আজ বিড়িও আছে, লাইটারও আছে। আপনার কাছে আর হাত পাততে হবে না। দাঁড়ান, একটা সুখটান দিয়ে নি।"

বিড়ি জ্বালিয়ে একটা টান দিয়ে গোকুল বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কতদিনের রিলেশন ছিল?"

রূপম বলল, “বেশ কিছুদিন, স্টেডি রিলেশন ছিল বলতে পারেন। তবে এইসব কথা না বললে ভালো হত।”

গোকুল বললেন, “এই যে আপনি ছাদে চলে আসছেন মাঝরাতে, এইসবই হল আপনার পুরোনো প্রেম চেগে ওঠার কনসিকোয়েন্স। আপনি এসব যত ভাববেন, তত আপনি নিজের মাথা খারাপ করবেন।”

রূপম বলল, “আমি তো সচেতন অবস্থায় ভাবিনি। স্বপ্নে এলে কী করব?”

গোকুল বললেন, “সবই তো অবচেতন মনে জমিয়ে রেখেছেন। আপনার চেঞ্জে যাওয়া দরকার এখন।”

রূপম বলল, “সে তো আপনারাই আটকে রেখে দিলেন। এখান থেকে বেরিয়ে গুরগাঁও গিয়ে অফিস জয়েন করতে পারলে ভালো হত।”

“গুরগাঁও? সেও তো ডেঞ্জার জায়গা শুনেছি। ওই খাপ পঞ্চায়েত-টেত আছে না কাছেপিঠে?”

রূপম হাসল, “এখন তো গোটা দেশ জুড়েই খাপ পঞ্চায়েত বসছে যত দিন যাচ্ছে। অত চিন্তা করে কী হবে আর?”

গোকুলবাবু মাথা নাড়লেন, “খুব একটা ভুল বলেননি। ক্রাইমের রেশিও আমাদের এখানেও হুহু করে বাড়ছে। রেপের প্রবণতা, ইভটিজিং কোনও কিছুই কন্ট্রোলের মধ্যে নেই। ক-দিন পরে হয়তো আপনাদের আশেপাশের শহরগুলোতেও এখানকার রেপিস্টের দেখাদেখি রেপ শুরু হবে। মানুষ তো খারাপটাকে আইডল বানিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি। নইলে আইএসআইএসে এত লোক ভরতি হয়?”

রূপম বলল, “আপনি রেপিস্টটাকে ধরতে পারবেন? যদি ধরতে পারেন, আমার হাতে একবার দিতে পারবেন? খুব বেশি সময়ের জন্য দরকার নেই। মিনিট পাঁচেক?”

গোকুলবাবু বললেন, “হিন্দি সিনেমা পেয়েছেন নাকি মশাই? ঢিসুম ঢিসুম করবেন?”

রূপম বলল, “এই লোকটার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।”

গোকুলবাবু বললেন, “এটা কোনও কথা না, আমাদের কারও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমরা যে হারে পলিউশন করি, গাছ কাটি, নিজের অজান্তেই আমরা এক-একজন বড়ো বড়ো খুনি।”

রূপম বলল, “আপনার এত সহানুভূতি আসে?”

গোকুলবাবু বললেন, “অপরাধকে ঘৃণা করো, অপরাধীকে নয়। অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। মেনে চলুন। ভালো থাকবেন।”

রূপম বলল, “কোনও ক্লু পেয়েছেন?”

গোকুলবাবুর বিড়িটা শেষ হয়ে গেছিল, হাত বাড়িয়ে ছাদ বাড়িয়ে বিড়ির ধ্বংসাবশেষটা ছাদ থেকে ফেলতে ফেলতে বললেন, “ছাই পেয়েছি।”

রূপম হতাশ হল, “এতদিনে কিছুই পেলেন না?”

গোকুলবাবু মিটিমিট হাসতে হাসতে বললেন, “আপনি না একজন স্কলার? ছাইতেও অমূল্যরতন থাকতে পারে, কবি বলেছেন, ভুলে গেলেন?”

৪৭

মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছে অনেকবার।

ভোররাতের দিকে আর শুয়ে থাকতে পারল না নারান। দিন যত এগিয়ে আসে উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে। আর আজ তো সেই দিন।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। উঠে আয়নার কাছে গেল।

নিজের মুখটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

দাড়ি কাটা হচ্ছে না দু-দিন ধরে। মেয়েটা যখন তার মুখ দেখবে, হঠাৎ বিস্ময় আর আতঙ্কমিশ্রিত ভয় নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাবে, তখন দাড়ি থাকলে দেখতে ভালো লাগবে না। নারান দাড়ি কাটতে বসল।

অনেকক্ষণ ধরে গালে ক্রিম মাখাল সে।

তারপর ক্ষুর দিয়ে একটু একটু করে মন দিয়ে দাড়িটা কাটল। দাড়ি কাটা শেষ হলে আফটারশেভ লোশন দিল মুখে। ক্ষুরটা মগে বসানো ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এটাও তো একটা চমৎকার অস্ত্র। ওখানে চালাতে পারলে...

ভাবতেই শরীরটা উত্তেজিত হতে শুরু করল তার।

উঠল সে।

খাটের তলায় স্যুটকেসটা আছে।

সেটা বের করে বড়োবাজার থেকে কেনা ইমিটেশনগুলো বের করল।

একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে সেগুলো ভরে নিজের ঘরের দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল। ভোরবেলা। খুব বেশি লোক রাস্তায় বেরোয়নি। নারান মাঝে মাঝেই সকালে হাঁটে। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। সে নিরীহ মুখ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। পরিত্যক্ত ইটভাঁটার কাছে এসে গাছের ঝোপের ভিতরে গয়নার ব্যাগটা নামাল।

তারপর হাঁটু গেড়ে বসল সে।

দোকানের সামনে বুড়োদের আলোচনায় সে শুনেছিল প্রতিটা ম্যাচের শুরুর আগে পিচের কাছে গিয়ে সচিন চোখ বন্ধ করে ভাবত কীভাবে বোলার বল করবে আর কীভাবে সে খেলবে।

সে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করে নিচ্ছিল পুরোটা। প্রথমে আধলা মেরে মাথা ফাটানো, তারপরই টার্গেট পড়ে যেতেই বেশি নাড়াচাড়া করলে মাথায় হাতুড়ি চালানো, বডি নিস্তেজ হয়ে এলে ক্ষুর? নারান খানিকক্ষণ ভাবল। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। ঠিক করল পরিস্থিতির উপরে ছেড়ে দেবে। সবকিছু হয়ে গেলে ইমিটেশনের গয়নাগুলো পরিয়ে দিলেই হবে।

মনে মনে ভাবছিল, আজ দুপুরে যখন কাণ্ডটা হবে আর বিকেলে গোটা প্রতাপনগরের লোক দেখবে নগ্ন মেয়েটাকে গয়না পরিয়ে গেছে সে, তখন কেমন প্রতিক্রিয়া হবে।

বাবা দিয়েছিল হাতঘড়িটা। দম দিয়ে চালাতে হয়। নারান সময় দেখল। পৌনে সাতটা বাজে। এবার আর দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। পা চালাল সে। রাস্তায় দু-শালিকও দেখে নিল। মন দিয়ে প্রণাম করল। খুশি হল। দু-শালিক মানে আবার ছক্কা হাঁকাবে আজ।

আজ মনঃসংযোগের দিন। অন্য কোনও দিকে তাকালে হবে না। প্রথমে দোকানে যাবে। দোকান খুলে বসতে হবে। ছেলেটাকে দোকানে বসিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টার ছোট্ট অপারেশন।

নারান বাড়ি এল। বউ উঠে পড়েছে। গোটা বাড়িটা জল দিয়ে ধোয়া চলছে এখন। সে ঢুকল না। দাঁড়িয়ে থাকল। জল দিয়ে ধোয়ার সময় ঘরে ঢুকলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে শুচিবাই মহিলা।

নারান বাইরের বেঞ্চিতে বসল। রোদ উঠছে, গরম পড়বে আজ।

যত রোদ ওঠে, তত মানুষ বাড়ির বাইরে কম বেরোয়, ইটভাঁটার সামনে দিয়ে মানুষের যাতায়াতের সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। সে খুশি হল।

বউ বাইরে এল। এখন বাড়ির সামনেটা ধোয়া হবে।

"ঘরে ঢোকার সময় জুতো বাইরে রেখে ঢুকো দয়া করে।"

নারান কথাটা শুনল, কিছু বলল না।

লোকের চোখে পড়ে যাবে নেহাত, নইলে এই মহিলাকে প্রায়ই কুপিয়ে পিস পিস করে মাংস্টা কুকুরকে খাইয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দিন দিন একটা মাংসপিণ্ড আর শুচিবায়ুর শোকেসে পরিণত হচ্ছে। শেষ কবে তারা একসাথে শুয়েছে মনে করতে পারে না নারান।

জুতো খুলে ঘরে ঢুকে চা বানিয়ে খেল সে।

সকালের টিফিনটা বাড়ির ভরসায় রেখে দিলে এগারোটা বাজবে। তৈরি হয়ে বেরোল ।

সকালে লোকে বাজার করতে যাচ্ছে। নারান বাজারে ঢুকে ধীরেসুস্থে সুবলের দোকানে বসল।

সুবল লুচি ঘুগনি বানায় চমৎকার। ঘুগনির উপরে কুচি কুচি পেঁয়াজ ছড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয় খেতে লাগে। নারান প্রথমে চারটে লুচি নিল। তারপর দুটো লুচি নিতে আরও ঘুগনি দিল তাকে। খাওয়া শেষে চা নিয়ে বসল কিছুক্ষণ।

নারান মনে মনে একটা হিসেব করল। সব রেখে থুয়েও সুবল কম করে দিনে পাঁচহাজার টাকা বিক্রি করে। প্রতাপনগরে সুবলের একচেটিয়া ব্যবসা। শুধু টিফিন বেচে আর সন্ধ্যায় চপ বেচেই দোতলা বাড়ি করে ফেলেছে।

দোকানটা কিন্তু ঝুপড়িই রেখেছে। নারান মনে মনে হাসল। এটা খুব ভালো বিজনেস প্ল্যান। ঝুপড়ি দোকানে ভালো রান্না হলে সবাই আসে। দোকান ধোপদুরস্ত হলে নিম্নমধ্যবিত্তরা আসে না। ভাবে দাম বেশি। সুবল খুব ভালো বোঝে ব্যবসাটা।

টাকা দিয়ে বেরিয়ে সে নিজের দোকান খুলল। ছেলেটা ঘুম ঘুম চোখে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে দিয়ে দোকান ঝাড় দিয়ে সে ক্যাশে বসল, এমন সময় একজন এসে বলল, “আচ্ছা দাদা, এখানে সিনেমা হলটা কোথায় বলতে পারেন?”

নারান লোকটাকে চিনতে পারল না। এলাকার না হয়তো।

সে সিনেমা হলের দিকনির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

এবার মনঃসংযোগের সময়।

৪৮

মধুমিতার বয়ফ্রেন্ড নাকি কোন এক অ্যাঞ্জেল প্রিয়ার ছবিতে লাইক করেছে। মধুমিতার তাই মনখারাপ।

স্যার আসতে একটু দেরি করছিলেন। মধুমিতা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে ওর দুঃখের কথা জানাচ্ছিল। স্যার দুটো উইক সকালে পড়াবেন বলেছেন। বিকেলে নাকি কোথায় যাবার কথা আছে।

স্কুল বন্ধ এখন। কীসব কাজ চলছে স্কুলে।

দিনটা ভালোই কাটছে আজকাল। দাদা বলেছে বিকেলবেলায় সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে।

আমাদের এখানে কোনও মাল্টিপ্লেক্স নেই।

একটাই সিনেমা হল। তার আবার গালভরা নাম রত্নবীণা। আমি দাদাকে বললাম রত্নবীণাতে তো এসি নেই। বউদি দেখতে পারবে?

দাদা বলে দিয়েছে সেটা শুরুতেই বউদিকে বলার দরকার নেই। তাহলে আর বউদি যাবে না।

আমার খুব মজা লেগেছে। বউদি যদি হলে ঢুকে বোঝে এসি নেই তাহলে কী করবে? উঠে চলে যাবে? দিদিও যাবে সিনেমা দেখতে। আমি দিদিকে আলগোছে জিজ্ঞেস করেছি, "হ্যাঁ রে, অয়নদাকে নিয়ে যাবি নাকি?"

দিদি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছে, "অয়ন কেন যাবে? ও কি আমাদের ফ্যামিলির লোক?"

আমি মনে মনে বলেছি “হ্যাঁ বাড়ির জামাই হয় তো”, আর মুখে বলেছি, “না, কী হয় গেলে? সবাই মিলে গেলে মজা হবে বেশ।”

দিদি বলেছে, “তুই এক কাজ কর না, দাদাকে বল গিয়ে।”

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলেছি, “আমি কেন বলতে যাব? তুই-ই বল। তোর বন্ধু।”

দিদি বলেছে, “মিলি, তুই কিন্তু ভীষণ পেকেছিস। আমি দাদাকে সব বলব তুই কী কী করছিস আজকাল।”

আমি ওই একইরকম মুখ করে ছিলাম, বললাম, “কী করছি রে দিদি? বটগাছের তলায় দেখা করছি কারও সাথে?”

দিদি বড়ো বড়ো চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “সেটা আবার কী?”

আমি বুঝেছি কেলো করে ফেলছি। চুপচাপ সে জায়গা থেকে সরে বাবার পাশে গিয়ে বসেছি। বাবার কাছে থাকলে দিদি বেশি খাপ খুলতে পারে না। শুধু দূর থেকে আগুনে দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভস্ম করে দেবার বৃথা চেষ্টা করবে।

আজ স্যার পড়ানো শুরু করতেই মধুমিতা বলল, “স্যার আপনি একটু সেলিম আর আনারকলির পার্টটা পড়াবেন?”

স্যার অবাক হয়ে বললেন, “সেলিম আর আনারকলির পার্ট মানে?”

মধুমিতা বলল, “স্যার কালকে একটা সিনেমা দেখলাম। আকবরের ছেলে নাকি একজনের সাথে প্রেম করেছিল। তার নাম আনারকলি। আকবর তাকে ব্লক করে দিয়েছিল। মানে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল। সেই পার্টটা পড়ান না স্যার।”

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

স্যার কয়েক সেকেন্ড মধুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?"

মধুমিতা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার, ইয়ার্কি কেন হবে? সেলিম আর আনারকলির গল্প আমাদের পড়াবেন না?"

স্যার রেগেমেগে বললেন, "এরপর যদি দেখেছি এইসব বলছ একদম সরাসরি বাড়িতে জানিয়ে দেব। নাও লেখো যা বলছ।"

ধমকধামক দিয়ে স্যার নোটস দেওয়া শুরু করলেন।

আমার একটা সমস্যা আছে। সেটা হল আমি কিছুতেই হাসি চাপতে পারি না। স্যার এদিকে আকবরের ধর্মনীতি নিয়ে নোটস দেওয়া শুরু করলেন আর আমার থেকে থেকে হাসি পেতে লাগল। হাসিটাকে অনেক কষ্টে চেপে রাখছিলাম। কিন্তু যেই একবার মধুমিতা আমাকে জোরে চিমটি কাটল আমি জোরে জোরে হেসে দিলাম।

স্যার নোটস দেওয়া থামিয়ে আমাকে বললেন, "কী হল তোমার? এত হাসি আসছে কোত্থেকে? বাড়িতে বলব?"

আমি বললাম, "না স্যার, পুরোনো একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই হাসি এল।" বলে আবার হাসতে শুরু করলাম।

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমাদের ব্যাচের মতো বাজে ব্যাচ আমি আর দেখিনি। এত ফাজিল হলে হয় নাকি? শুধু ঠাট্টা ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু করো না। দাঁড়াও তোমাদের একটা টেস্ট নেব নেক্সট উইকে। যার রেজাল্ট খারাপ হবে তার গার্জিয়ানদের ডেকে আমি নিজে কথা বলব। হচ্ছে তোমাদের, দাঁড়াও।"

মধুমিতা ফস করে বলে বসল, “স্যার আমার বাবা মা তো বেড়াতে গেছে। আমি গার্জিয়ান কোত্থেকে পাব?”

স্যার বললেন, “ফিরুন ওনারা। তোমার আর মিলির ব্যাপারে আলাদা করে কথা বলব। তোমরা ভীষণ বাড় বেড়েছ।”

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। স্যার নোটস দেওয়া শুরু করলেন। আমি জিভ কামড়ে অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলাম।

পড়া শেষ হলে বেরিয়ে মধুমিতা বলল, “স্যার একদম চাপ খেয়ে গেছিল সেলিম আর আনারকলির নামে।”

আমি হাসলাম। অনেকক্ষণ ধরে।

মধুমিতা বলল, “জানিস মা কী বলে? মেয়েদের বেশি হাসতে নেই। যত হাসে তত কান্না, বলে গেছে কপিল শর্মা।”

আমার আরও হাসি পেয়ে গেল। বললাম, “এসব সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা যত্তসব।”

মধুমিতা বলল, “আজ আমার মনটা ভালো নেই রে। স্যারের ওখানে হাসলাম বটে কিন্তু ও সেই অ্যাঞ্জেল প্রিয়ার ছবিতে লাইক করেছে ভাবতেই আমার কেমন রাগ রাগ ফিলিং আসছে।”

আমি বললাম, “তুই এক কাজ কর। সব ছেলেদের ছবিতে লাইক কর আর বেশি বেশি করে কমেন্ট কর।”

মধুমিতা উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, “ঠিক বলেছিস। দারুণ আইডিয়া। আর জানিস তো, মোবাইল থেকে ঠিক গুছিয়ে সব করা যায় না। কম্পিউটারে বসতে পারলে ভালো হয়। শোন না, আমার সঙ্গে চ।”

আমি বললাম, “কোথায়?”

মধুমিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “সাইবার কাফেতে। বসে বসে ব্যাটার পিন্ডি চটকাই।”

আমি বললাম, “না না, তুই যা, আমার আজ সিনেমা দেখতে যাবার কথা সবাই মিলে। অনেক কাজ পড়ে আছে বাড়িতে।”

মধুমিতা ঠোঁট উলটাল, “ও, তোর তো এখন ব্যাপারই আলাদা। ঘ্যামই আলাদা। দাদা বউদি এসেছে। অনেক কাজ তো হবেই। আচ্ছা, যা তাহলে, আমি সাইবার কাফে চললাম।”

মধুমিতা অন্য রাস্তায় চলে গেল।

আমি পা চালালাম। ওর ভরসায় থাকলে আর বাড়ি যাওয়া হবে না। রোজ রোজ ওর এক-না-এক বাহানা থাকে বাড়ি না ফেরার।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে হবে।

৪৯

শিকার ধরার সময় বাঘ কী করে? প্রথমে শিকারকে অনুসরণ করে, শিকারের ওপরে সব মনঃসংযোগ দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

এই সময়টা বড়ো ভালো লাগে নারানের। অপেক্ষা করে থাকা।

কোনও বড়ো অনুষ্ঠানের আগে গায়ক যখন অপেক্ষা করে থাকে, কিংবা একটা উইকেট পড়ার পর দেশের সেরা ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করতে নামে, তখন কেমন লাগে তার? হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকে, নিজের সেরাটা দেবার জন্য ছটফট করতে থাকে সে।

বেশ ভালো গরম পড়েছে। রোদের তাপে সাধারণ মানুষের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব না। নারানের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। সে মাথায় একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় বসে আছে।

মাথাটা গরম হচ্ছে। ঠান্ডা করা প্রয়োজন।

ঘড়ি বলছে দশটা পঁয়তাল্লিশ। সময় হয়ে গেছে। যে-কোনও সময় কচি মেয়েটা...

নারাণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইটের গাদার পিছনে শরীরটাকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর...

এবার আর ছ-মাস অপেক্ষা করা গেল না। যত দিন যাচ্ছে, শরীরটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না। একটা ঘটনা ঘটাবার এত তাড়াতাড়ি পরবর্তী ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, কী-ই বা হবে? সে মনকে প্রবোধ দিল। শরীর যখন অবাধ্য হয়ে যায় তখন আর-কোনও বাধানিষেধ মানা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

একটা সাইকেল আসছে। নারান জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে।

তারপর হতাশ হয়। একটা লোক। বাজার থেকে ফিরছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে নারান।

লোকটা শর্টকাট করছে। এই রাস্তাটা দিয়ে খুব কম লোকই যাতায়াত করে।

তবু সাবধানের মার নেই। মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ চাপা দিয়ে পিছনের ইটের গাদার দিকে নিয়ে গেলে রাস্তা থেকে কারও দেখার সম্ভাবনা নেই।

লোকটা চলে গেলে নারান আবার বেরোল। হাতে আধলা।

খসখস একটা শব্দ হচ্ছে। নারান চুপ করে দেখল।

সেই সাপটা।

একটা ইটের গাদার থেকে জঙ্গলের দিকে চুপচাপ চলে গেল। মিশমিশে কালো সাপ। ফণা আছে।

নারান হাসল।

তার থেকে বিষাক্ত আর কে আছে! এলাকায় লোকে তাকে দেখলে কত ভালো ব্যবহার করে। কারও বাড়ির সামনে দেখলে হাসিমুখে ঘরে নিয়ে মিষ্টি খাওয়ায়।

কারও বাড়ির সামনে সাপ বেরোলে লোকে ভয়ে আতঙ্কেই অস্থির হয়ে পড়ে। অথচ সাপ কারও ক্ষতি করে না যতক্ষণ না নিজের কোনও ক্ষতি হচ্ছে।

কী হতে পারে এই সাপটা? কেউটে? না গোখরো? বাজারের আশিসখুড়ো খুব ভালো সাপ ধরতে পারে। এককালে এলাকায় সাপ বেরোলে আশিস খুড়োর ডাক পড়ত। খুড়ো চোখ বন্ধ করে সাপ খুঁজে সেটাকে মারত। তারপর একদিন খুড়োর বৈরাগ্য এল।

সবাই যখন খুড়োকে সাপ মারতে নিয়ে যেত খুড়ো প্রথমেই শর্ত দিয়ে দিত, "দ্যাখো বাপু, সাপ মারতে পারব না। আমি কিন্তু ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দেব।"

তাতেই সবাই রাজি হয়ে গেল।

সেটা এক দেখার মতো জিনিস হত। এলাকার লোক অবাক হয়ে দেখত খুড়ো পরম যত্নে বিষধর সাপগুলোকে কী এক কায়দায় ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিচ্ছে।

লোকটা সাপের কামড়েই মরল। কিন্তু মরার সময়েও কী পরম প্রশান্তি চোখে মুখে। বলেছিল, "পাপের শাস্তি দিল ঈশ্বর আমাকে, কত সাপ মেরেছি। আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা কোরো না তোমরা। ও জাতসাপ, এ বিষ ছাড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।"

নারান নিজের দু-গালে জোরে জোরে দুটো চড় মারল, এখন অন্য কিছু ভাবার সময় না, কম সময়ে, কাজ হাসিল করার সময়।

কান খাড়া করল সে, আসছে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ... মেয়েটা আসছে।

প্রথম লাইটপোস্টটা পেরোচ্ছে, সে আধলাটা শক্ত হাতে ধরল, এবার তাক করার সময়। দ্বিতীয় লাইটপোস্টের কাছে এলেই ছুড়তে হবে আধলাটা। মিস হলে দৌড়ে গিয়ে গলাটা ধরতে হবে। নারান জঙ্গল ছেড়ে বেরোল, মেয়েটার সঙ্গে দূরত্ব কমাতে হবে আধলাটা ছোড়ার আগে।

মেয়েটা বেশ জোরে হাঁটছে, এই সেই মেয়েটা, যার বাড়ির সামনে পাগলটা তাড়া করেছিল তাকে, এসে পড়েছে মেয়েটা, এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, নারান আধলাটা ছুড়তে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই তার মাথায় একটা ইট এসে পড়ল।

চারদিক কালো হয়ে এল, তার হাত থেকে আধলাটা পড়ে গেল।

নারান অবিশ্বাসীর মতো কোনওভাবে পিছনে তাকিয়ে দেখল পাগলটা লাফাতে লাফাতে বলছে, "আউট আউট আউট আউট।" মেয়েটা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখছে।

নারান আর চোখ খুলে রাখতে পারল না।

পড়ে গেল।

৫০

রূপসী থরথর করে কাঁপছিল।

গোকুলবাবু এগিয়ে এসে নারানের মাথায় হাত দিলেন। হাতে গামছা চুঁইয়ে খানিকটা রক্ত এসে লাগল। তাঁর পরনে একটা ছেঁড়া জামা, আর লুঙ্গি। জামার ভিতরের পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে বললেন, “ফোর্স পাঠান। অপারেশন সাক্সেসফুল।”

নারানের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, “হ্যাঁ, ফাঁসির দড়ি পরার জন্য এখনও বেঁচে থাকতে হবে বাছাধনকে।” তারপর রূপসীকে বললেন, “বুড়োশিবতলার বটগাছে তেনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে আপনাকে এই রুটটাই নিতে হয়? মিনিমাম সেন্সটুকু নেই আপনার?”

রূপসী কোনওভাবে কথা বলতে পারল, “আপনি পাগল নন?”

গোকুলবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “আপনার মাথায় উকুন আছে?”

রূপসী অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

গোকুলবাবু বললেন, “মানে আবার কী, উকুন থাকলেই তো অ্যান্টি-উকুন শ্যাম্পু থাকার চান্স থাকে, তাই না? তা আপনার বাড়িতে আছে সে শ্যাম্পু?”

রূপসী মাথা নাড়ল, “না আমার আর আমার বোনের কারও মাথায় উকুন নেই।”

“তা শ্যাম্পু আছে তো?”

রূপসী বলল, “হ্যাঁ তা আছে।”

গোকুলবাবু বললেন, “আচ্ছা। আজ একটু মন দিয়ে শ্যাম্পু করতে হবে। আর আপনাদের বাড়িতে তো আজ মাংস হচ্ছে।”

রূপসী অবাক হয়ে বলল, “আপনি কী করে জানলেন?”

গোকুলবাবু বললেন, “সেসব থার্ড আই থাকে আমাদের, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লোক কী সাধে হলাম মশাই? এই যে, যে ছেলেটা আপনাদের বাড়ি এসে দেখা করত, তাকেই আপনি মিট করতে রাধার অভিসারের মতো এই দুর্গম পথ দিয়ে যান সেটাও তো আমিই বের করেছিলাম। হ্যাঁ, আর ইনিও করেছিলেন অবশ্য। আপনার বোনকে ফলো করতে করতে ইনি, মানে এই যে, দেখুন তো এনাকে চিনতে পারেন নাকি?”

গোকুলবাবু নারানের মাথা থেকে গামছাটা সরালেন। “এ কী!!!এ তো বাজারের দোকানদার! কী যেন নাম!!!”

গোকুলবাবু জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, “নারান। আপনাকে ওই বাকি মেয়েগুলোর মতো অবস্থা করার জন্য তাক করে বসে ছিল।”

রূপসী বসে পড়ল রাস্তাতেই। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, “আপনি না এলে আজ কী হত?”

গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আর কী হত, আপনি তো আবার বুড়োশিবতলায় দেখা করতে চলেই গেলেন। আমার আর কী হবে?”

রূপসী বুঝল না, “মানে?”

গোকুলবাবু বললেন, “আর মানে শুনে কাজ নেই। শুনুন। আপনি পুলিশ এলে তো বলতে পারবেন না বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন! তাহলে কী বলবেন?”

রূপসী বিহ্বল চোখে গোকুলবাবুর দিকে তাকাল, “কী বলব?”

গোকুলবাবু বললেন, “যাই বলবেন, ভেবে রাখুন। আর নইলে সত্যিটাই বলুন। সত্যি বললে চাপ কম থাকে।”

রূপসী মাথা নেড়ে বলল, "বাড়িতে তো সঞ্চারীদের বাড়ি যাবার নাম করে বেরোই, বোনেরও এই সময় পড়া থাকে, দাদা বউদি আছে বাড়িতে, সত্যি কথা বললে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে যাব তো।"

গোকুলবাবু কয়েক সেকেন্ড মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এক কাজ করুন, বাড়ি চলে যান। আপনাকে উইটনেস হতে হবে না। আমি সামলে নেব।"

রূপসী শূন্য চোখে গোকুলবাবুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "এই লোকটাই মোমদিকে...?"

গোকুলবাবু মাথা উপর নীচ করলেন।

বিস্ময়, আতঙ্ক আর ঘেন্নামেশানো মুখে রূপসী খানিকক্ষণ পড়ে থাকা নারানের বডিটার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, "আমি উইটনেস হব। সত্যি কথাটাই নাহয় বলব।"

গোকুলবাবু কয়েক সেকেন্ড রূপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহ। আগুন আছে। এই তো চাই। তবে আপনি এখন যান। আমি বুঝে নেব। যেতে পারবেন? ভয় পাবেন না তো?"

রূপসী উঠে দাঁড়াল। বলল, "না। আমি অপেক্ষা করছি। আমি যাব না।"

গোকুলবাবু কাঁধ ঝাঁকালেন, "অ্যাজ ইউ উইশ।"

তারপর নারানের দিকে ঝুঁকে বসলেন, মুখে চুকচুক শব্দ করতে করতে নারানকে বললেন, "বস ইউ আর টু গুড। মানতেই হচ্ছে। আমার মতো ঘুঘুকেও এতদিন উকুন সহ্য করতে হল। শুধু একটু অধৈর্য না হলে কার বাপের সাধ্যি ছিল আপনাকে ধরে। আপনার জন্য আমি ফিল করি, বিশ্বাস করুন।"

রূপসী অবাক হয়ে বলল, "মানে? একটা রেপিস্ট মার্ডারের জন্য আপনি ফিল করেন?"

গোকুলবাবু বললেন, "করব না? আপনাদের এই মফস্সলে এত বড়ো একটা শিল্পী ছিল, আপনারা জানতেই পারেননি! এইসব লোককে ধরতে তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আসবে। আ হা হা, কী শিল্প, জাস্ট ভাবুন, কাজ সেরে আবার চুপটি করে দোকানে বসে পড়ছে। নিরীহ নির্বিরোধী লোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ হতও না আমার, শুধু যেদিন আপনার বোনকে ফলো করেছিল, সেদিন একটু ভুল করে ফেলেছিল। কোইনসিডেন্স বলতে পারেন। আমার চোখেই এর চোখটা পড়ে গেছিল। প্রাইমারি টার্গেট আপনার বোনই ছিল সম্ভবত, পরে কেস স্টাডি করতে গিয়ে বুঝেছিল এই রুট দিয়ে এই সময়ে আপনি যান, আর আপনার বোন আজকাল বাজার হয়ে ফেরে। তাই টার্গেট চেঞ্জ করে ফেলেছিল। আমি বুঝেছিলাম আগেই।"

রূপসী বলল, "তাহলে আমাকে সতর্ক করে দেননি কেন?"

গোকুলবাবু রক্তমাখা হাতটা ঘাসে খানিকক্ষণ ঘষে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বললেন, "আপনাকে সতর্ক করলে আপনি আর এই রুটে আসতেন? তাহলে ধরা পড়ত কী করে?"

রূপসী খানিকক্ষণ গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই পাগল। অভিনয়টা তাই সহজে করতে পারেন।"

গোকুলবাবু দাঁত বের করলেন। "তা যা বলেছেন। নইলে ফ্যামিলি ছেড়ে কেউ মশার কামড় খায় রাস্তায় শুয়ে, বলুন? বাই দ্য ওয়ে, আপনি আমাকে রেগুলার ভাত দিতেন। একটা পাগলের জন্য আপনি ফিল করেন। এইজন্য, ধুস... কীসব বলে ফেলছি, আপনি তো আবার বুড়োশিবতলার বটগাছের ওখানে..."

থানার গাড়ি চলে এসেছিল। মাইতিবাবু নেমে অবাক চোখে গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনিই মুখার্জি সাহেব?”

গোকুলবাবু বিড়ি টানতে টানতে বললেন, “ওইসব পিরিতের গল্প পরে করবেন, আগে এই মালটাকে জ্ঞান ফিরিয়ে গ্যারেজ করুন। খুনি ধরলে তো হবে না, আসল কাজ তো প্রমাণ করা। তারপর আবার মানবাধিক... ধুস...”

৫১

অন্যান্য দিনের মতোই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল রূপমের। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, "এরপরেও?"

ঘড়িটা নাইটবাল্বের পাশেই। দেখল রাত আড়াইটা বাজে। কী অদ্ভুত! রোজ ঠিক এই সময়েই তার ঘুম ভাঙছে।

শ্রাবন্তী ঘুমোচ্ছে। সে খানিকক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে রইল।

তারপর খাট থেকে নামল। টেবিলে বোতল রাখা আছে। বেশ খানিকটা জল খেয়ে সোফায় বসল।

"কী হল তোমার?"

রূপম দেখল শ্রাবন্তী উঠে বসেছে।

রূপম বলল, "কিছু না, তুমি ঘুমোও।"

শ্রাবন্তী বলল, "মোমের কথা মনে পড়ছে?"

এই প্রথম শ্রাবন্তীর মুখে মোমের নাম শুনল রূপম। সে একটু থমকে বলল, "হ্যাঁ।"

শ্রাবন্তী খাট থেকে নামল। লাইট জ্বালাল। তার পাশে এসে বসল। বলল, "ঘুমোনোর চেষ্টা করো।"

রূপম ভেবেছিল শ্রাবন্তী রেগে যাবে, কথা শোনাবে। হঠাৎ করে এরকম কথায় সে অবাকই হল খানিকটা। মুখে কিছু বলল না।

শ্রাবন্তী বলল, "ঘুমোতে চেষ্টা না করলে তো দুঃস্বপ্নটাই বারবার দেখবে। আমিও জেগে যাব। আমার ভেতরে যে আছে, সেও জেগে যাবে।"

রূপম শ্রাবন্তীর কথা শুনে ওর দিকে তাকাল। এই ক-দিনের দৌড়াদৌড়িতে সে তবে আসল কথাটাই ভুলে যেতে বসেছিল!

সে বলল, "তুমি ডিসিশন নিয়েছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "হ্যাঁ। আমি ডিসিশন নিয়েছি। আমি প্রস্তুত।"

রূপম অনেকদিন পরে শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। শ্রাবন্তী যে কথাটা বলল সেটাই কি পৃথিবীতে তার কানে শোনা এখন পর্যন্ত সবথেকে মিষ্টি কথা?

শ্রাবন্তী বলল, "তুমি কিছু বলবে না?"

রূপম অস্ফুটে বলল, "থ্যাংকস।"

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

শ্রাবন্তী বলল, "উফ, একটু বৃষ্টি হলে বাঁচি। হাওয়া দিচ্ছে বোধহয়, না? জানলাটা খুলে দাও তো।"

রূপম উঠে জানলাটা খুলল। প্রবল বেগে হাওয়া বইছে।

শ্রাবন্তী বলল, "এই, ছাদে যাবে?"

রূপম অবাক হল। শ্রাবন্তী এত চেঞ্জ হয়ে গেল কী করে?

সে বলল, "এত রাতে ছাদে যাবে? পাগল নাকি? তোমার কী হয়েছে বলো তো? রাগি রাগি ছিলে, সেটাই তো ভালো ছিল। হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেলে আমারই তো ভয় লেগে যাচ্ছে।"

শ্রাবন্তী হাসল। বলল, "আমি তো ঠিকই করে নিয়েছিলাম অ্যাবর্ট করব। কারও কথাই শুনব না। তুমি অফিস চলে যাবে। একা একা আমি বাচ্চা সামলাব? তুমি যেদিন চলে এলে, আমি রাতে শুয়ে আছি। আগে তো একাই শুতাম, কিন্তু তুমি যাবার পরে কেন

জানি না ভয় ভয় লাগছিল। হঠাৎ করেই সেদিন আমার মনে হল, আমি তো একা নেই। আমার সাথে আরও একজন আছে। আমার ভিতরে সে বাড়ছে ধীরে ধীরে। কোত্থেকে যেন সাহস চলে এল। নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম জানো। সকালে উঠে ডাক্তার আন্টির কাছে গিয়ে বীরের মতো বললাম, আমার বাচ্চার জন্য কী কী করতে হবে বলে ফ্যালো। ডাক্তার আন্টি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, এই মেয়েটা নির্ঘাত পাগল আছে। আমার ভিতরের জনই বোধহয় আমাকে পালটে ফেলছে। তোমার জন্য ভাবাচ্ছে। তোমাদের সবার জন্য ভাবাচ্ছে।”

রূপমের মনে হচ্ছিল না কথাগুলো শ্রাবন্তী বলছে। সে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল। শ্রাবন্তী তার হাত ধরে টানল, “ছাদে চলো তো।”

রূপম চুপচাপ শ্রাবন্তীর হাত ধরে ছাদে উঠল।

গোকুলবাবু সব মিটিয়ে দুপুরে তাদের বাড়ি এসেছিলেন। চুল দাড়ি কেটে ধোপদুরস্ত হয়ে। তাদের বাথরুমেই স্নান করলেন। রূপমকে বললেন, “বন্ধুর বাড়ি ব্যবহার করলাম, রাগ করলেন না তো?”

রূপম কৃতজ্ঞতায় কিছু বলতে পারেনি। একটা সময় গোকুলবাবু আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাকে বললেন, “আপনার বোন সাক্ষী দেবেন। পাশে থাকবেন। খুব বেশি চাপ হবে না অবশ্য। ব্যাটা কনফেস করে গেছে। তবু, আর সবকিছুতে পাশে থাকবেন ওর। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটা পাগলকে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পরম মমতায় কেউ ভাত দেয় না।”

রূপম গোকুলবাবুর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল।

মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় রূপসী কেমন তার ন্যাওটা ছিল। আজ যদি ওর কিছু হত, কী হত তাদের পরিবারের?

রূপম ছাদ থেকে অভ্যাসবশত গোকুলবাবুর বসার জায়গাটার দিকে তাকাল। কেউ বসে নেই। ভদ্রলোক এতদিন পর হয়তো বাড়িতে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। রূপম মনে মনে বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে।"

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল। রূপম শ্রাবন্তীকে বলল, "ভিজে যাব। চলো।"

শ্রাবন্তী চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "একদম না। ভিজব আজ। যা হয় হবে।"

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দুজনের কেউই কোনও কথা বলছিল না। শুধু ভিজে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর শ্রাবন্তী রূপমের বুকে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি, আমার মেয়ে হবে। ওর নাম দেব মোম, কেমন?"

রূপম কথা বলতে পারল না...

৫২ মিলি

আমার আসলে হেব্বি রাগ করা উচিত। কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত না। কিংবা দিদির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া উচিত।

সমস্যা হল সেটা করতে পারছি না। দিদিকে দেখলেই কেমন যেন জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে।

যখনই মনে আসছে আমার দিদিটাকে ওই ভয়ংকর লোকটা... ততবার শিউরে উঠছি। আমার তো এখনও বিশ্বাস হয় না। কতবার ওই দোকানে গেছি। ছেলেদের চোখ দেখলে মেয়েরা বুঝতে পারে। লোকটার তো সেরকমও কিছু ছিল না। সেই যেবার পাগলের তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল সেবার নাকি আমাকে ফলো করে এসেছিল। তবে লোকটা ধরা পড়ার পর একটা উপকার হয়েছে।

আজকাল রাতে আর ওই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটা দেখি না। তবে যতবার মনে পড়ে পাগলটা আসলে গোয়েন্দা ছিল ততবার লজ্জা লাগে। ইশ, কত ভ্যাংচাতাম।

লোকটা অবশ্য বেশ ভালো। আমার জন্য একটা ইয়াব্বড়ো চকোলেট নিয়ে এসেছিল। তারপর কানে কানে বলেছে, "আর-একবার ভ্যাংচাবে নাকি? তুমি কিন্তু ভ্যাংচ্যানোতে বেশ ভালো। মানে অলিম্পিকে যদি ভ্যাংচানোর কোনও ইভেন্ট হত তাহলে নির্ঘাত তুমি ফার্স্ট প্রাইজ পেতে, বিশ্বাস করো।"

আমি লোকটাকে ভেংচে দিয়ে পালিয়েছি।

অয়নদার কথাটা জানার পর থেকে বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলাম। দিদিকে একটা রামচিমটিও দিয়েছি। তারপর ভেবে দেখেছি দুটোতে খারাপ মানাবে না। আর

জাম্বুকে একটু-আধটু ঝাড়ি মারা তো আইনের বইতে লেখাই আছে। সুতরাং চাপ নিয়ে কী হবে বস!

দিদির কানে কানে বলেছি, "শেষ পর্যন্ত সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার করলি?"

দিদি আমার কান মুলে দিয়ে বলেছে, "বেশ করেছি।"

ওহ আসল কথাই তো বলা হয়নি। বউদি এখন আমাদের বাড়িতেই আছে। ভাইপো বা ভাইঝি হবার পরে যাবে। কিন্তু কথা সেটা না। কথাটা হল বউদি পুরো চেঞ্জ। সকালবেলা উঠে নিজের হাতে রান্না করবে। দুপুরে আমাদের সঙ্গে লুডো খেলবে। কে চোট্টা করল তাই নিয়ে তুমুল ঝামেলা করবে। আমার কাজ হয়েছে এখন বউদির জন্য তেঁতুল জোগাড় করে আনা। বাবাও আজকাল বউদিকে ভয় পাচ্ছে না। দিব্যি খেলার চ্যানেল দেখছে বউদি সামনে থাকলেও।

আমি পড়ার ব্যাচে আজকাল বেশ ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি। ইতিহাস স্যার পর্যন্ত আমার ফাজলামিতে বিরক্ত হয়ে গার্জিয়ান কলের হুমকি দিচ্ছেন না।

দুঃখের খবর একটাই। মধুমিতার হিরো হীরালাল আর ওকে পাত্তা দিচ্ছে না। তাতে অবশ্য ওর খুব একটা যায় আসে না। ইদানীং কোথাকার এক মাসল পঞ্চুর সঙ্গে খুব চ্যাট করছে। ছেলেটা নাকি দু-হাত ছেড়ে বাইক চালাতে পারে। ডান্সও করে।

একটা ডান্সের ভিডিয়ো আপলোড করেছে ফেসবুকে। সেটা দেখিয়ে মধুমিতা আমায় বলেছিল, "দারুণ না?"

আমি মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, "পুরো হিরো আলম।"

তারপর থেকে মধুমিতা আর আমার সঙ্গে কথা বলছে না...